POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

‘হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি; এবং আল্লাহ্‌র শোকরগুযারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক’

(আল-বাকারা: ১৭৩)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

সংখ্যা 41

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 10 Oct, 2024 6 রবিউল সানি 1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

পুরুষদের জন্য রেশমী বস্ত্র পরিধান করা নিষিদ্ধ

২৬৪০) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন- হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মসজিদের দরজার কাছে এক রেশমী বস্ত্র বিক্রি হতে দেখেন। তিনি বলেন, হে রসুলুল্লাহ্! যদি আপনি এটি ক্রয় করেন এবং জুমআর দিন এবং প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এটি পরিধানের জন্য এটা খুবই উপযুক্ত হবে। আঁ হযরত (সা.) বললেন: এটা সেই ব্যক্তিই পরিধান করে যার পরকালে কোন অংশ নেই। এরপর কিছু রেশমী বস্ত্র এলে আঁ হযরত (সা.) সেগুলির মধ্য থেকে একটি হযরত উমর (রা.) কেও দেন। হযরত উমর জানতে চান যে, এটা কি আপনি আমাকে পরিধানের জন্য দিয়েছেন? অথচ রেশমি বস্ত্র প্রসঙ্গে আপনি যা বলেছেন সেটাই শেষ কথা। আঁ হযরত (সা.) বললেন, আমি এটা তোমাকে নিজের পরিধানের জন্য দিই নি।’ হযরত উমর (রা.) সেটি তাঁর এক ভাইকে দিয়ে দেন, যে মক্কায় মুশরিক ছিল।

২৬৪১) হযরত আলি (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে , তিনি বলেন: নবী (সা.) আমাকে একটি রেশমি বস্ত্র উপহার দেন। আমি সেটি পরিধান করি। এরপর আমি আঁ হযরত (সা.)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ দেখতে পাই। আমি সেটিকে ফেড়ে স্ত্রীদের মধ্যে বিতরণ করে দিই।

(সহীহ আল বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হিবা)

ইহজগত ত্যাগ করার পূর্বেই মানুষের উচিত খোদা তা'লার সঙ্গে বোঝাপড়া করা

উচ্চ নৈতিকতা অর্জন করা এবং তাকওয়া অবলম্বন করা একজন ব্যক্তির জন্য মহৎ কাজ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

স্মরণ রেখো, বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার জন তাকওয়া জরুরী। আর এর জন্য বর্তমান যুগে সর্বোত্তম পন্থা হল আমার কাছে অবস্থান করা। সর্বপ্রথম মৌলবী নুরুদ্দীন এই রহস্য অনুধাবন করেছেন আর তিনি কেবল খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধর্ম অর্জন করার জন্য এখানে জঙ্গালে পড়ে আছেন। তিনি অনেক বড় আত্মত্যাগ করেছেন। নিজের ধনসম্পদ ও সহায় সম্পত্তি ত্যাগ করেছেন এবং বনবাসের ন্যায় জীবন যাপন করছেন। আমি দৃঢ় নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি যে, মৌলবী সাহেবের মত যোগ্যতার মানুষ যদি লাহোর বা অমৃতসরে থাকতেন, তবে সেখানে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক লাভবান হতে পারতেন। আর লাহোর ও অমৃতসরবাসীও বেশ কয়েকবার তাঁকে অনুরোধ করেছেন তাঁকে সেকানে গিয়ে থাকার জন্য। কিন্তু তিনি কখনই এখানে থাকার উপর অন্য স্থানের আয় এবং লাভলোকসানকে প্রধান্য দেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। এই ধরণের মানুষ হওয়া উচিত, এমন চেতনা ও দৃঢ় ঈমান নিয়ে এখানে আসা উচিত।

অতঃপর আমি দেখতে পাই যে, আমাদের জামাতের কিছু সদস্য প্রতি বছর ইহকাল ত্যাগ করে যান। আগামী বছর কে থাকবে আর কাকে ডেকে পাঠানো হবে সে কথা কে জানে? তাই ইহজগত ত্যাগ করার পূর্বেই মানুষের উচিত খোদা তা'লার সঙ্গে বোঝাপড়া করা এবং সত্য কথা এই যে, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঐশী কল্যাণ লাভ করতে পারে না ,যতক্ষণ খোদা প্রেরিত ব্যক্তির সাথে তার সত্যিকার ভালবাসা না তৈরী হয়। আর সেই ভালবাসার প্রমাণ হল সে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে।

সুফিগণ যা কিছু বলেন তা মুরীদের ততক্ষণ কোন উপকারে আসে না, যতক্ষণ সে তাঁর মুর্শিদকে সর্বোত্তম জ্ঞান না করে। আমার মতে এ বিষয়টি অবশ্যই জরুরী। কেননা, যারা বলে মুর্শিদ বা গুরুর জন্য সর্বক্ষণ গুরু গম্ভীর মুখ নিয়ে বসে থাকা উচিত, আমার মতে তাদের কথা সঠিক নয়। মানুষ নিজের নৈতিকতাকে কেন বিসর্জন দিবে?

একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের জন্য কখনই নবীগণের পথ ত্যাগ করা উচিত নয়। তাদের অনেক বেশি দয়ালু ও মহানুভব হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস, যারা খোদার পক্ষ থেকে নবুয়তের পথে আসেন, তাদের সঙ্গে থাকে উচ্চ মার্গের নৈতিকতা। আমার মতে আম্বিয়াগণের প্রশংসার বিপরীতে তাদের বিরোধিতা করা কুফর বা ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ।

অতএব, উচ্চ নৈতিকতা অর্জন করা এবং তাকওয়া অবলম্বন করা একজন ব্যক্তির জন্য মহৎ কাজ। এই জন্যই সত্যবাদীদের সাহচর্য দরকার হয়। তাই কিভাবে আমার সংস্পর্শে থাকা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা কর।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড,পৃ:৩৮)

اَطِعْ اَبَاكَ

(নিজ পিতার আনুগত্য কর)

পিতার আনুগত্য করা সন্তানের জন্য কেবল সৌভাগ্যের কারণই নয় বরং পিতা সন্তানের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী ও অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে তাঁর আনুগত্য করা মঙ্গলজনক। (হাদীস)

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৪ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৩০ শে আগস্ট ২০২৪

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ওয়াকফে নও স্কীমটির প্রবর্তন করেছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহর রাবে (রহ.)। উদ্দেশ্য ছিল মা-বাবা জন্মের পূর্বে হযরত মরিয়মের মায়ের আদর্শ অনুসরণে এবং তাঁর দোয়ার মাধ্যমে যেন নিজেদের সন্তানকে ওয়াকফ করে আর জন্মের সময় এই দোয়া করতে থাকে যে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যে সন্তান দান করবেন সে যেন ধর্মের সেবক হয় আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নিরন্তর এই দোয়া করতে থাকে। আর তার লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষাও যেমন এমনভাবে হয় যে সে ধর্মের সেবার যোগ্য হয়ে ওঠে।

সীরাতুন্নাবীন জলসা আমরা উদযাপন করি না এমন কথা কে বলেছে? আমরা মীলাদুন্নাবী জলসার আয়োজন সেই দিনটিতে করি না যা অ-আহমদীরা আরম্ভ করেছে। সীরাতুন্নবী জলসা তো আহমদীরাই প্রথম আরম্ভ করেছিল। এর আগে তা কোনদিন হত না। হিন্দু ও খৃষ্টানরা যখন আঁ হযরত (সা.)-এর উপর আপত্তি উত্থাপন করতে শুরু করল, সেই সময় সর্বপ্রথম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এগিয়ে এসে তাদের উত্তর দেন এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর যগে জলসার প্রচলন শুরু হয়। কাদিয়ানে অনেকবার এমনও হয়েছে যে এই জলসার সময় অনেকবার মিছিলও বের হয়েছে। মিছিল এর অর্থ দরুদ পাঠ করতে করতে দলে দলে মানুষ অলিগলিতে হেঁটে চলত। তাই আমরা এই জলসা উদযাপন করি আর আমরাই এর সূচনা করেছি।

আঠারো বছর পরিণত বয়স, এই বয়সে রোযা রাখা উচিত। আর এর আগে রোযা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

কনের নিকাহ্র ক্ষেত্রে তার পিতা কিংবা ভাই অনুপস্থিত থাকলে কনের রক্তের আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হতে যিনি মর্যাদার দিক থেকে তার সবচেয়ে বেশি নিকটাত্মীয়- তিনিই তার ওলী হবেন।

এমন খেলা- মুখোমুখি বসে খেলা হোক কিংবা বিভিন্ন এ্যাপস এর মাধ্যমে অন লাইনে অর্থ বিনিয়োগ করে খেলা হোক না কেন, সকল পরিস্থিতিতে জুয়া হিসেবেই আখ্যায়িত হয়- যা করতে বারণ আছে। বাড়িতে ছোট বাচ্চাদের পরিবারের লোকদের সাথে এভাবে জন্মদিন পালন করা এবং কেক ইত্যাদি কাটা- যাতে কোন প্রকার বি'দাতের মিশ্রণ না থাকে, অনর্থক খরচ করা না হয় এবং কোন প্রকার অনৈসলামিক কার্যক্রম না হলে এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এর পাশাপাশি আল্লাহ্র রাস্তায় সদকা হিসেবেও কিছু না কিছু দেওয়া উচিত এবং বাচ্চাদেরকে এই উপদেশও দেওয়া উচিত যে, তারা যেন সে-দিন (অর্থাৎ জন্মদিনে) বিশেষভাবে নফল আদায় করে এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, তিনি তাদেরকে সুস্বাস্থ্যময় জীবন দান করেছেন এবং অনাগত জীবনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর কৃপা যাচনা করে।

বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ও মৌলিক বিষয়ের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গে করা প্রশ্নের হুযুর আনোয়ার (আই.)-প্রদত্ত উত্তর

প্রশ্ন: অনেকে আছে যারা ওয়াকফে নও নয়, কিন্তু তাদের ভীষণ ইচ্ছে হয় ওয়াকফে নও হওয়ার। তাদের জন্য কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন:তাদের পিতামাতার তাদেরকে ওয়াকফ করা উচিত ছিল। যারা করেছে, তাদের উদ্দেশ্য হলা সন্তানরা যেন ধর্মের সেবা করতে পারে। তারা ওয়াকফ করেছে যাতে সন্তানরা বড় হয়ে জ্ঞানার্জন করে ধর্মের সেবা করে-কেউ ডাক্তার হয়ে সেবা করতে পারে, কেউ শিক্ষক হিসেবে সেবা করতে পারে, কেউ ভাষা শেখানোর মাধ্যমে। এখন নিজেকে ওয়াকফ করে ধর্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেও সে ওয়াকফ হবে। আল্লাহ্ তা'লা কোথাও একথা লিখে রাখেন নি যে যারা ওয়াকফে নও-এ আছে কেবল তাদের ওয়াকফই গ্রহণ করবেন। পৃথিবীতে অনেকে আছেন যারা ধর্মের সেবা করছেন, তারা তো ওয়াকফ নও নন। আমাদের যুগে ওয়াকফে নও-এর কোনও স্কীম ছিল না, কিন্তু আমরাও তো ওয়াকফ ছিলাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি তোমরা ওয়াকফে নও-এর উপাধি গ্রহণ কর আর নিয়মিত নামায না পড়, কুরআন শরীফ না পড়, ধর্ম সেবার প্রেরণা না থাকে আর নিজেকে ওয়াকফে নও হওয়ার দাবি কর তবে তা কোন উপকারে আসবে না। এটি তোমাদের কোনও ওয়াকফই নয়। আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। অপর দিকে অন্য একটি মেয়ে আছে যে ওয়াকফে নও নয়, কিন্ত সে নামায পড়ে, কুরআন পড়ে, ধর্মের জ্ঞানও অর্জন করে, ধর্ম সেবাও করে-এমন মেয়ে ওয়াকফে নও -এর থেকে উত্তম।

প্রশ্ন: সন্তানকে জন্মের পূর্বে কেন ওয়াকফ করা হয়, পরে কেন করতে পারি না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: জন্মের পর ওয়াকফ করতে কে বাধা দিয়েছে? কেউ তো বাধা দেয় নি। ওয়াকফে নও স্কীমটির প্রবর্তন করেছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহর রাবে (রহ.)। উদ্দেশ্য ছিল মা-বাবা জন্মের পূর্বে হযরত মরিয়মের মায়ের আদর্শ অনুসরণে এবং তাঁর দোয়ার মাধ্যমে যেন নিজেদের সন্তানকে ওয়াকফ করে আর জন্মের সময় এই দোয়া করতে থাকে যে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যে সন্তান দান করবেন সে যেন ধর্মের সেবক হয় আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নিরন্তর এই দোয়া করতে থাকে। আর তার লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষাও যেমন এমনভাবে হয় যে সে ধর্মের সেবার যোগ্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া জন্মের পরও যদি মা-বাবা যথাযথ লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার পর সন্তানকে ওয়াকফ করে, সেটাও সম্ভব। অনেক ওয়াকফে জিন্দেগী যারা ওয়াকফে নও নয়, কিন্তু জামেয়াতে পড়ছে আর অনেকে জামাতের অন্যান্য কাজের মাধ্যমে সেবা দান করছে।

প্রশ্ন: আমার এক বন্ধু বলেছিল, আমরা নাকি 'আল্লাহ্' কিম্বা 'আলাইসাল্লাহু' খোদিত আংটি এই দুটি আঙুলে পরতে পারি না। কারণ, হযরত মহম্মদ (সা.)-এর শত্রুরা নাকি এই দুটি আঙুলে আংটি পরত। আমার প্রশ্ন হল আমরা কোন্ আঙুলে আংটি পরব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে আঙুলে ঠিক মত হয় সে আঙুলেই পর। এতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। অনেককে আমি আংটি দিই, তাদের মধ্যে যাদের আঙুল বড় তাদেরকে বলি এখানেই পর যে আঙুলে তোমার সঠিক হয়। এটি অহেতুক গল্প তৈরী করে রেখেছে। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানের সময় এই আঙুলটি তোলা হয়। এই

এরপর ৮ পাতায়...

জুমআর খুতবা

উফক এর ঘটনার মাধ্যমে কেবল একজন সতীসাধ্বী, অতিশয় খোদাভীরু ও পুণ্যবতী নারীর সতীত্বের ওপর আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য ছিল না, বরং মূল উদ্দেশ্য ছিল; পরোক্ষভাবে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সম্মানকে ধূলিস্মাৎ করা এবং ইসলামী সমাজে এক ভয়ঙ্কর কম্পন সৃষ্টি করা। আর মুনাফিকরা এই নোংরা ও হীন প্রচারণাকে এরূপে প্রচার করেছিল যে, কতক সরলমনা কিন্তু প্রকৃত মুসলমানও তাদের প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে হোঁচট খেয়েছিল। (সীরাত খাতামান্নবীঈন)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এছাড়া 'আমি তো একথা ভুলতে পারি না যে, হাস্‌সান মহানবী (সা.)-এর সমর্থ নে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করতেন।'

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের দেখা উচিত যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর যে অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল? এর কারণ এটি হতে পারে না যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে তাদের কোনো শত্রুতা ছিল। ঘরে অবস্থানকারী এক নারী, যার সাথে না রাজনীতির সম্পর্ক আছে, আর না বিচার বিভাগের, না পদের, আর না সম্পদ বন্টণের, না লড়াইয়ের আর না বিরোধী জাতিগুলোর ওপর আক্রমণের, না রাজত্বের আর না অর্থনীতির- এমন নারীর সাথে কারো কী বিদ্বেষ থাকতে পারে?

সামান্য চিন্তাভাবনা করলেও বুঝা যায়, সামান্য মনোযোগেও বোঝা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের মাধ্যমে দু'জন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ করা যেতো। প্রথমত, মহানবী (সা.)-এর প্রতি আর দ্বিতীয়ত, হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি, কেননা তিনি (অর্থাৎ আয়েশা) ছিলেন একজনের সহধর্মিণী আর অন্যজনের কন্যা। এ দু'জন ব্যক্তিই এমন যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কলঙ্কিত করা শত্রুদের ক্ষেত্রে কতক ব্যক্তির জন্য লাভজনক হতে পারত কিংবা কতক ব্যক্তির স্বার্থ তাদেরকে দুর্নাম করার সাথে জড়িত ছিল।

সাহাবীগণ নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, রসূল করীম (স.) এর পর তাদের মধ্যে যদি কেউ মর্যাদাবান থাকেন তবে তিনি হলেন আবু বকর (রা.)। আর তিনিই তাঁর খলীফা হওয়ার যোগ্য।

তিনি অবশ্যই এই নূরকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যাকে চাইবেন খলীফা বানাবেন, বরং তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন নয় বরং বেশ কিছু ব্যক্তিবর্গকে খেলাফতের আসনে সমাসীন করে এই নূরের যুগকে দীর্ঘায়িত করবেন। তোমরা যদি অপবাদ আরোপ করতে চাও তাহলে নিঃসন্দেহে আরোপ করো, কিন্তু তোমরা খেলাফতকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না এবং আবু বকরকেও খেলাফত থেকে বঞ্চিত রাখতে পারবে না, কেননা খেলাফত একটি নূর, এটি আল্লাহ্‌র নূর প্রকাশের একটি মাধ্যম। এটিকে মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় কীভাবে ধ্বংস করতে পারে!

উফক এর ঘটনার প্রেক্ষিতে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর একটি দিক

ইমাম মহম্মদ বেলু সাহেব (সুডান) এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব।

সুদানী আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান। আল্লাহ্ তা'লা পরিস্থিতিতে বদল আনুন, তাদের প্রতি কৃপা করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩০ আগস্ট জুলাই, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (৩০ জহুর, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত খুতবাগুলোতে অর্থ াৎ জার্মানি জলসার পূর্বে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বরাতে আলোচনা হচ্ছিল এবং এতে হযরত আয়েশা (রা.)-র 'ইফক'-এর ঘটনারও উল্লেখ ছিল। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদা তা'লা স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মাঝে এটি নিহিত রেখেছেন যে, তিনি ওয়ীদ (তথা শাস্তি) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে তওবা, এস্তেগফার, দোয়া এবং সদকার বিনিময়ে টলিয়ে দেন। অনুরূপভাবে মানুষকেও তিনি এই বৈশিষ্ট্যই প্রদান করেছেন। যেভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা এটি সাব্যস্ত যে, হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে মুনাফিকরা কেবল নোংরামীর বশবতী হয়ে বাস্তবতা বিবর্জিত অপবাদ আরোপ করেছিল, এই রটনায় কোনো কোনো সরলমনা সাহাবীও জড়িয়ে পড়েছিলেন। একজন সাহাবী এমন ছিলেন যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-র বাড়িতে দু'বেলা খাবার খেতেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার এই অপরাধের জন্য শপথ করেন এবং ওয়ীদ(তথা শাস্তির) স্বরূপ প্র তিজ্ঞা করেছিলেন, আমি এই অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ তাকে কখনো খাবার দিবো না। এ (ঘটনার) প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যে, وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (সূরা আন্ নূর: ২৩) তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন এবং যথারীতি আবার তাকে খাবার দিতে আরম্ভ করেন।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এ কারণেই এটি ইসলামী বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত যে, যদি ওয়ীদরূপে কোনো প্রতিজ্ঞা করা হয় তবে তা ভঙ্গ করা উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যভুক্ত। যেমন, কেউ যদি তার সেবক

সম্পর্কে কসম খায় যে, আমি অবশ্যই তাকে পঞ্চাশ জুতা মারবো সেক্ষেত্রে তার (অর্থাৎ সেবকের) তওবা ও অনুতাপের কারণে ক্ষমা করে দেওয়া ইসলামী রীতি সম্মত; যেন সে তাখাল্লাখু বিআখলাকিল্লাহ (তথা আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত) হয়ে যায়। কিন্তু ওয়াদা তথা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বৈধ নয়। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য জবাবদিহি করতে হবে কিন্তু ওয়ীদ ভঙ্গের কারণে নয়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, পরিশিষ্টাংশ, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ১৮১)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে, বুখারী শরীফের আলোকে ইফ্‌ক-এর ঘটনা বর্ণনা করেন এবং এ সম্পর্কে লিখেন, 'এ বিষয়ে এই রেওয়ায়েতটি অন্য সব রেওয়ায়েতের তুলনায় বিশদ ও নিরবচ্ছিন্ন আর যেসব বিষয় অন্যান্য বর্ণনাকারীর বর্ণনা থেকে পৃথক খণ্ডরূপে পাওয়া যায় তা এই হাদীসে একত্রিত হয়েছে। এছাড়া এই হাদীস দ্বারা মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবনের এমন এক জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে আলোকপাত হয় যা কোনো ঐতিহাসিক উপেক্ষা করতে পারে না। নির্ভরযোগ্যতার নিরিখেও এই হাদীস এমন উচ্চমানে অধিষ্ঠিত যাতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। এখন লক্ষণীয় বিষয় হলো, এটি কীরূপ ভয়ানক নৈরাজ্য ছিল যা মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে কেবল একজন সতীসাধ্বী, অতিশয় খোদাভীরু ও পুণ্যবতী নারীর সতীত্বের ওপর আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য ছিল না, বরং মূল উদ্দেশ্য ছিল; পরোক্ষভাবে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সম্মানকে ধূলিস্মাৎ করা এবং ইসলামী সমাজে এক ভয়ঙ্কর কম্পন সৃষ্টি করা। আর মুনাফিকরা এই নোংরা ও হীন প্রচারণাকে এরূপে প্রচার করেছিল যে, কতক সরলমনা কিন্তু প্রকৃত মুসলমানও তাদের প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে হোঁচট খেয়েছিল। (তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার শিকার হয়েছিল।) তাদের মধ্যে কবি হাস্‌সান বিন সাবেত, যয়নাব বিনতে জাহাশের বোন হামনা বিনতে জাহাশ এবং মিসতাহ্ বিন উসাসাহ্-এর নাম বিশেষভাবে উল্লে খযোগ্য। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)-র এটি একটি মহান চরিত্রিক গুণ যে, তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের সম্বন্ধে নিজের হৃদয়ে কোনো প্রকার অসন্তোষ পুষে রাখেন নি। অতএব, রেওয়ায়েত এসেছে, এরপর যখনই হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-র সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন তখন তিনি খুবই স্বতঃস্ফূতভাবে তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। একদা (তিনি) হযরত আয়েশা (রা.)-র সমীপে উপস্থিত হলে তখন মাসরূক নামের একজন মুসলমানও সেখানে উপস্থিত ছিল। মাসরূক বিস্ময়ের সাথে বলে, আপনি হাস্‌সানকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দিচ্ছেন! হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বলেন, 'বাদ দাও, বেচারা চোখের সমস্যায় ভুগছে, এটা কি তার জন্য কম কষ্টের কারণ।'(তার চোখে রোগ দেখা দিয়েছিল)। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এছাড়া 'আমি তো একথা ভুলতে পারি না যে, হাস্‌সান মহানবী (সা.)-এর সমর্থ নে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করতেন।'

অতএব, হযরত হাস্‌সানকে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি ভেতরে এসে বসেন এবং হযরত আয়েশা (রা.)-র প্র শংসায় এই পঙক্তি পাঠ করেন,

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ
وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

(উচ্চারণ: 'হাসানুন রেযানুন মাতাযান্নু বিরীবা, ওয়া তুসবিহু গারছা মিন লুহুমিল্ গওয়াফিলু')

অর্থাৎ তিনি একজন সতীসাধ্বী ও পুণ্যবতী রমণী এবং বিদুষী ও বুদ্ধিমতি নারী আর তার অবস্থান সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। আর তিনি কোনো উদাসীন ও নিরপরাধ নারীর মাংস ভক্ষণ করেন না অর্থাৎ তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করেন না এবং তাদের সম্বন্ধে কোনো গীবত (বা পরচর্চাও) করেন না।হযরত আয়েশা (রা.) এই পঙক্তি শুনে বলেন 'ওয়ালাকিন আন্‌তা' আরেক বর্ণনায় এটিও এসেছে 'লাসতা কাযালিকা' অর্থাৎ তোমার নিজের অবস্থা কি? তুমি তো এই গুণের অধিকারী সাব্যস্ত হও নি। অর্থাৎ তুমি তো আমার মতো নিরপরাধের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপে অংশ নিয়েছ।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) প্রাচ্যবিদ ম্যুর সাহেবের বরাত দিয়ে লিখেন, ('ম্যুর - এর) আরবী পাণ্ডিত্য ও বিদ্বেষের একটি উদাহরণ দেখুন! (তিনি) এই পঙক্তির একেবারে ভুল ও আরবী ব্যাকরণের বিপরীত অর্থ করে লিখেছে যে, হাস্‌সান (এখানে) হযরত আয়েশার কমনীয় শরীরের প্র শংসা করেছিল। তখন হযরত আয়েশা রসিকতা করে তার স্থুল দেহ সম্পর্কে ঠাট্টা করেন।" তিনি (রা.) লিখেন, ম্যুর সাহেব এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আরও সুস্পষ্ট ভুল করেছেন। যেমন (তিনি) লিখেছেন 'সাফওয়ান এবং আয়েশা পথিমধ্যে সেনাদলের কাছে পৌঁছতে পারেন নি আর পরবর্তীতে জনসম্মুখে তারা মদীনায় প্রবেশ করেন।' অথচ একথা একেবারেই ভুল ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কেননা হাদীস এবং ইতিহাস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, সাফওয়ান ও হযরত আয়েশা (রা.) কয়েক ঘন্টা পরেই পথিমধ্যে ইসলামী সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি (রা.) লিখছেন, মজার বিষয় হলো, মুল অপবাদ সম্পর্কে ম্যুর সাহেব হযরত আয়েশার নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন, 'আয়েশার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবন বলে দেয় যে, তিনি এই অপবাদ থেকে মুক্ত ছিলেন। যদিও যৌক্তিক এবং দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে এই অপবাদ পুরোপুরি ভ্রান্ত এবং মিথ্যা প্রতীয়মান হয়, কেননা এই সুস্পষ্ট আকস্মিক ঘটনা ব্যতীত যে, হযরত আয়েশা ইসলামী সেনাবাহীনির পেছনে থেকে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সাফওয়ানের সাথে সেনাবাহীনির সাথে মিলিত হন, (এটি ছাড়া) অপবাদ আরোপকারীদের হাতে আর কোনো কিছু ছিল না। অর্থাৎ তাদের কাছে না কোনো সাক্ষী ছিল আর না-ই অন্য কোনো প্রমাণ ছিল। আর এটি জানা কথা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ সেটিকে আদৌ সত্য মনে করা হয় না। বিশেষত এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে যাদের জীবন তাদের পবিত্র হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে কিন্তু মুসলমানদের অধিক প্রশান্তির জন্য আর এই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, ভবিষ্যতে এমন বিষয়াদির ক্ষেত্রে একটি নীতিগত পন্থা নির্ধারণ করার জন্য খোদার ওহী অবতীর্ণ হয় যা কেবল এই অপবাদকে নিতান্ত অসত্য আখ্যায়িত করে হযরত আয়েশা (রা.) এবং সাফওয়ান বিন মু'আত্তাল (রা.)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করেনি, বরং ভবিষ্যতের জন্য এজাতীয় ঘটনাবলি সংক্রান্ত এমন একটি মূলনীতি জগতের সামনে উপস্থাপন করে যার ওপর মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রম এবং সমাজের শান্তি -শৃঙ্খলা আর জাতীর (সবার) চরিত্রের সুরক্ষার মূলভিত্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৬৭-৫৬৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের কারণ সম্পর্কে বলেন,

আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? এর কারণ এটি হতে পারে না যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে তাদের কোনো শত্রুতা ছিল। ঘরে অবস্থানকারী এক নারী, যার সাথে না রাজনীতির সম্পর্ক আছে, আর না বিচার বিভাগের, না পদের, আর না সম্পদ বন্টণের, না লড়াইয়ের আর না বিরোধী জাতিগুলোর ওপর আক্রমণের, না রাজত্বের আর না অর্থনীতির- এমন নারীর সাথে কারো কী বিদ্বেষ থাকতে পারে? যেহেতু এসব বিষয়ের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। অতএব হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে সরাসরি বিদ্বেষের কোনো কারণ থাকতে পারে না। এই অপবাদের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ই ঘটতে পারে। হয় এই যে, নাউযুবিল্লাহ্, এই অপবাদ সঠিক, যা কোনো মু'মিন এক মুহূর্তের জন্যেও মেনে নিতে পারে না, বিশেষত যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আরশ থেকে এই নোংরা ধারণার অপনোদন করেছেন। আর দ্বিতীয়ত এটি হতে পারে যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ অন্য কতিপয় ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে আরোপ করা হয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, তারা কারা ছিলেন যাদেরকে কলঙ্কিত করা মুনাফিক ও তাদের সর্দারদের জন্য লাভজনক হতে পারতো এবং মুনাফিকরা এভাবে কাদের প্রতি তাদের শত্রুতা প্রকাশ করতে পারতো। সামান্য চিন্তাভাবনা করলেও বুঝা যায়, সামান্য মনোযোগেও বোঝা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের মাধ্যমে দু'জন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ করা যেতো। প্রথমত, মহানবী (সা.)-এর প্রতি আর দ্বিতীয়ত, হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি, কেননা তিনি (অর্থাৎ আয়েশা) ছিলেন একজনের সহধর্মিণী আর অন্যজনের কন্যা। এ দু'জন ব্যক্তিই এমন যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কলঙ্কিত করা শত্রুদের ক্ষেত্রে কতক ব্যক্তির জন্য লাভজনক হতে পারত কিংবা কতক ব্যক্তির স্বার্থ তাদেরকে দুর্নাম করার সাথে জড়িত ছিল। নতুবা শুধুমাত্র হযরত আয়েশা (রা.)-কে কলঙ্কিত করার প্রতি কারো কোনো আগ্রহ থাকতে পারে না। খুব বেশি হলে তাঁর দুর্নামের সাথে তাঁর সতীনদের সম্পর্ক থাকতে পারে। অর্থাৎ তাঁর সতীন বা মহানবী (সা.)-এর অন্য সহধর্মিণী যারা ছিল, তাদের সম্পর্ক থাকতে পারতো। আর এই ধারণা হতে পারত যে, সম্ভবত হযরত আয়েশা (রা.)-এর সতীনরা মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হযরত আয়েশাকে হেয় করার জন্য এবং নিজেদের সুনাম কুড়ানোর উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর সতীনরা এক্ষেত্রে কোনো

অংশ নেয়নি। বরং হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিজের বর্ণনা হলো, মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণীদের মধ্য থেকে যাকে আমি আমার প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতাম তিনি ছিলেন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)। তিনি ছাড়া অন্য কাউকে আমি নিজের প্রতিযোগী ভাবতাম না, কেননা তিনিই বেশি কথা বলতেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি যয়নবের এই অনুগ্রহকে কখনো ভুলতে পারব না যে, আমার প্রতি যখন অপবাদ দেওয়া হয় তখন সবচেয়ে জোরালোভাবে যদি কেউ সেই অপবাদ প্রত্যাখ্যান করত তবে তিনি ছিলেনযয়নব (রা.)। অতএব হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে যদি কারো শত্রুতা থাকে তাহলে তার সতীনদেরই থাকার কথা। আর তারা চাইলে এতে অংশ নিতে পারতেন, যেন হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অন্য স্ত্রীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, তারা এ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করেননি। আর যদি কারো কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, অর্থাৎ সেই সতিনদের মধ্য থেকে বা অন্য স্ত্রীদের মধ্য থেকে কাউকে যদি জিজ্ঞেসও করা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি হযরত আয়েশার প্রশংসাই করেছেন। মোটকথা নারীদের প্রতি পুরুষদের শত্রুতার কোনো কারণ নেই। অতএব, তার প্রতি অপবাদ হয় মহানবী(সা.) এর প্রতি বিদ্বেষের কারণে আরোপ করা হয়েছে অথবা হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষের কারণেএরূপ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা অপবাদ আরোপকারীরা কোনোভাবে কেড়ে নিতে পারতো না। যে বিষয়ে তাদের ভয় ছিল সেটি হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পরও তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হতে বঞ্চিত না রয়ে যায়। তারা দেখছিল যে, তাঁর (সা.) পর খলীফা হবার যোগ্য কেউ যদি থেকেথাকে তাহলে তিনি হলেন হযরত আবু বকর। অতএব এই আশঙ্কার কথা ভেবে তারা হযরত আয়েশার প্রতিঅপবাদ আরোপ করে যেন হযরত আয়েশা মহানবী (সা.) এর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হন এবং তার হেয় প্রতিপন্ন হবার কারণে হযরত আবু বকরের মুসলমানদের মধ্যে যে মর্যাদা ছিল তা-ওহ্রাস পেতে থাকে আর মুসলমানরা তাঁর প্রতি কুধারণা করে সেই বিশ্বাস ও আস্থা ত্যাগ করে যা তাঁর প্রতি তাদের ছিল। আর এভাবে রসূলে করীম (স.)-এর পর হযরত আবু বকরের খলীফা হওয়ার দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণেই খোদা তা'লা হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনার পর কুরআন শরীফে সূরা নূরে খিলাফতেরও উল্লেখ করেছেন।

"হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবীদের পরস্পরের সাথে কথাবার্তা হতো এবং তারা বলতেন, রসূলে করীম (স.)-এর পর যার মর্যাদা রয়েছে তিনি হলেন আবু বকর (রা.)।

(আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব ফিততাফসীল)

হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (স.) একবার হযরত আয়েশাকে বলেন, হে আয়েশা! আমি চাচ্ছিলাম আবু বকরকে আমার পর স্থলাভিষিক্ত করে যাই। কিন্তু আমি জানি যে, আল্লাহ্ তা'লা এবং মুমিনগণ তিনি ব্যতীত আর কাউকে গ্রহণ করবে না। তাই আমি কিছুই করছি না।"

(মুসলিম কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা)

অর্থাৎ তারা হযরত আবু বকরকেই নির্বাচিত করবে।

মোটকথা, সাহাবীগণ নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, রসূল করীম (স.) এর পর তাদের মধ্যে যদি কেউ মর্যাদাবান থাকেন তবে তিনি হলেন আবু বকর (রা.)। আর তিনিই তাঁর খলীফা হওয়ার যোগ্য।

মক্কী জীবন তো এরূপ ছিল যে, তাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং তার ব্যবস্থাপনার কোনো প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু মদিনাতে মহানবী (স.)-এর আগমনের পর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় আর স্বভাবতই মুনাফেকদের হৃদয়ে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হতে থাকে যে, তাঁর পর কেউ খলীফা হয়ে ইসলামী শাসন দীর্ঘায়িত না হয়ে যায় এবং আমরা চিরকালের জন্য ধ্বংস না হয়ে যাই। অর্থাৎ বিরোধীদের এই চিন্তা হয়, কেননা তাঁর (স.) মদিনায় আগমনের ফলে তাদের বহু আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, মদিনায় আরবদের দুটি গোত্র অওস এবং খাযরাজ সর্বদাই একে অপরের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকতো এবং তাদের মধ্যে হত্যা ও রক্তপাত লেগেই থাকত। যখন তারা দেখল যে, এ লড়াইয়ের ফলে আমাদের গোত্রের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাচ্ছে, তখন তারা নিজেদের মাঝে সন্ধির উদ্যোগ নেয় এবং অঙ্গীকার করে যে, আমরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হব এবং কোনো এক ব্যক্তিকে আমাদের রাজা বানাব। সুতরাং অওস এবং খাযরাজ গোত্র নিজেদের মাঝে সন্ধি করে নেয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে মদিনার রাজা বানানো হবে। এই সিদ্ধান্তের পর তারা প্রস্তুতিও আরম্ভ করে দেয় আর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের জন্য মুকুট বানানোর নির্দেশও দিয়ে দেওয়া হয়। এরই মাঝে মদিনার কিছু হাজী মক্কা থেকে ফেরত আসে এবং তারা বলে, শেষ যুগের নবী মক্কায় আগমন করেছেন এবং আমরা তঁ ার হাতে বয়আত করে এসেছি। তখন রসূলে করীম (স.)-এর দাবি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। এর ফলে মহানবী (সা.)-এর দাবি সম্পর্কে কানাঘুসো আরম্ভ হয়ে গেল এবং কিছুদিন পর আরো কিছু মানুষ মক্কায় এসে মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেন। অতঃপর তারা মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, আপনি আমাদের তরবিয়ত ও তবলীগের জন্য কোনো শিক্ষক আমাদের সাথে প্রেরণ করুন। অতএব মহানবী (সা.) একজন সাহাবীকে মুবাল্লিগ হিসাবে প্রেরণ করেন আর মদীনার অনেক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সে দিনগুলোতে যেহেতু মক্কায় মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর নিদারুণ অত্যাচার চালানো হচ্ছিল, তাই মদীনাবাসী মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, আপনি মদীনায় আগমন করুন। ফলে মহানবী (সা.) সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

(আসসীরাতুন নববীয়াত লি ইবনে হিশাম)

আর আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূলের জন্য যে মুকুট প্রস্তুত করা হচ্ছিল তা নিরাশা -ই রয়ে গেল, কেননা তারা যখন অর্থাৎ মদীনাবাসী যখন দোজাহানের বাদশাকে পেয়ে গেল তখন তাদের অন্য বাদশার কিবা দরকার!

আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল যখন এটি দেখল যে, তার বাদশা হবার সকল সম্ভাবনা হারিয়ে যাচ্ছে তখন সে ভীষণ রাগান্বিত হয়। আর যদিও বাহ্যত সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সর্বদা ইসলামে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করত এবং যেহেতু সে আর কিছু করতে পারছিল না, তাই তার হৃদয়ে এই বাসনা জাগ্রত হলো যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যুবরণ করবে এবং আমি মদীনার বাদশা হবো। খোদা তা'লা তাকে এ উদ্দেশ্যেও অপদস্থ করলেন, কেননা তার ছেলে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিল। এর অর্থ ছিল, সে যদি বাদশা হয়েও যেত তবে তার পরে রাজত্ব ইসলামের অধীনেই চলে আসত। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এটিকে এভাবেও ধূলিস্মাৎ করেন যে, মুসলমানদের মাঝে যখনই নতুন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তারা মহানবী (সা.)-কে এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করা আরম্ভ করে যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থার পদ্ধতি কী? আপনার পর ইসলামের কী হবে এবং এ বিষয়ে মুসলমানদের করণীয় কী? আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল যখন এহেন অবস্থা দেখতে পেল তখন তার ভয় হতে লাগল যে, এখন তো ইসলামী শাসনব্যবস্থা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে তার কোনো ভূমিকা থাকবে না। সে এসব অবস্থা প্রতিহত করতে চাইত। অতঃপর এজন্য যখন সে মনোনিবেশ করল তখন সে লক্ষ করল, ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে ইসলামী নীতির ওপর যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তবে তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রা.) আর মহানবী (সা.)-এর পর মুসলমানদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ এবং তারা তাঁকে সবার চেয়ে সম্মানিত মনে করেন। ফলে সে নিজের মঙ্গল এতেই মনে করল যে, তাঁকে বদনাম করা হোক এবং মানুষের দৃষ্টি থেকে তাঁকে নীচে পতিত করা হোক, বরং স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর চোখেও তাঁকে খাটো করা হোক। আর হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি যুদ্ধে পেছনে থেকে যাবার ঘটনা থেকে সে এই মন্দ উদ্দেশ্য পূরণের সুযোগ পেয়ে যায় এবং এই দুরাচারী তাঁর প্রতি চরম নোংরা একটি অপবাদ আরোপ করে যা কুরআন করীমে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে কিন্তু হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূলের এটি করার উদ্দেশ্য ছিল, এর ফলে হযরত আবু বকর (রা.)সেসব মানুষের দৃষ্টিতেও লাঞ্ছিত হয়ে যাবে এবং মহানবী (সা.)-এর সাথেও তাঁর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে আর এই ব্যবস্থাপনা-যা সে অবশ্যই প্র তিষ্ঠিত হতে দেখতে পাচ্ছিল এবং যার প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিস্মাৎ হয়ে যাচ্ছিল তার মাঝে ফাটল দেখা দেবে। কেননা মুনাফিক নিজের মৃত্যুকে সর্বদা দূরে দেখতে পায় এবং তারা এটি জানত না যে, মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই ছটফট করতে করতে মরবে। সে এই দিবাস্বপ্নই দেখে যাচ্ছিল যে, মহানবী (সা.) মারা গেলে আমি আরবের বাদশা হবো, কিন্তু এখন সে দেখল, আবু বকরের (রা.) পুণ্য, তাকওয়া এবং শ্রেষ্ঠত্ব মুসলমানরা স্বীকার করে নিয়েছে। যখন রসূলুল্লাহ (সা.) নামায পড়াতে আসেন না তখন আবু বকর তাঁর স্থলে নামায পড়ান। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে কোনো ফতোয়া জিজ্ঞেস করার সুযোগ না

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

থাকলে মুসলমানরা আবু বকরকে (রা.) ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। এটি দেখে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল ভবিষ্যতে রাজা হবার যে বাসনা লালন করছিল, খুবই চিন্তিত হলো। সে এর সুরাহা করতে চাইল। এই বিষয়টির সুরাহা করার জন্য এবং হযরত আবু বকর (রা.) -এর খ্যাতি ও তাঁর মর্যাদাকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে ধূলিস্মাৎ করার জন্য সে হযরত আয়েশা (রা.)-র ওপর অপবাদ আরোপ করল, যেন হযরত আয়েশা (রা.)-র বিরুদ্ধে দুর্নাম রটে যাওয়ার কারণে হযরত আয়েশার (রা.) প্রতি রসূলুল্লাহ (সা.) -এর ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর যেন হযরত আয়েশার (রা.) প্রতি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘৃণার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ (সা.) এবং মুসলমানদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) এর যে মর্যাদা রয়েছে তা কমে যায় এবং তাঁর (রা.) ভবিষ্যত খলীফা হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে।"

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫১৯-৫২৪)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) হযরত আবু বকরের (রা.) খেলাফতের সাথে ইফকের ঘটনার সম্পর্ক বর্ণ না করতে গিয়ে আরো লিখেন, সূরা নূরের শুরু থেকে এর শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়বস্তুই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে সেই অপবাদ আরোপের উল্লেখ করা হয়েছে যা হযরত আয়েশা (রা.)-এর ওপর আরোপ করা হয়েছিল। আর যেহেতু হযরত আয়েশার (রা.) ওপর অপবাদ আরোপের মূল উদ্দেশ্য ছিল হযরত আবু বকরকে (রা.) অপমানিত করা, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তার যে সম্পর্ক তা নষ্ট করা। এর ফলে মুসলমানদের দৃষ্টিতে তার সম্মানহানি হয় এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পরে তিনি খলীফা হতে না পারেন কেননা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল বুঝে গিয়েছিল রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে মুসলমানদের দৃষ্টি কারো প্রতি নিবদ্ধ হলে সেটা আবু বকরই হবেন। যদি আবু বকর (রা.)-এর মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূলের ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন কখনো পূর্ণ হবে না। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা এই অপবাদের পরপরই খেলাফতের উল্লে খ করেছেন এবং বলেছেন, খেলাফত সাম্রাজ্য নয়, বরং সেটি তো ঐশী নূরকে প্রজ্বলিত রাখার একটি মাধ্যম। এজন্য এর প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। এর বিনষ্ট হওয়া নবুওয়্যতের নূর এবং ঐশ্বরিক নূরের বিনাশ।

অতএব তিনি অবশ্যই এই নূরকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যাকে চাইবেন খলীফা বানাবেন, বরং তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন নয় বরং বেশ কিছু ব্যক্তিবর্গকে খেলাফতের আসনে সমাসীন করে এই নূরের যুগকে দীর্ঘায়িত করবেন। তোমরা যদি অপবাদ আরোপ করতে চাও তাহলে নিঃসন্দেহে আরোপ করো, কিন্তু তোমরা খেলাফতকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না এবং আবু বকরকেও খেলাফত থেকে বঞ্চিত রাখতে পারবে না, কেননা খেলাফত একটি নূর, এটি আল্লাহ্র নূর প্রকাশের একটি মাধ্যম। এটিকে মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় কীভাবে ধ্বংস করতে পারে! "

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫২৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "নবীগণের অবস্থাও তদ্রুপই হয়, যখন খোদা তা'লা কোনো বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেন তখন তারা সে বিষয়কে গ্রহণ করেন অথবা সরে যান। লক্ষ্য করো! আয়েশার (রা.) ইফকের ঘটনা প্রথমে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানানো হয় নি, এমনকি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.) নিজের পিত্রালয়ে চলে যান। মহানবী (সা.) এতদূর পর্যন্ত বলেন, যদি পাপ করে থাকো তাহলে তওবা করো। এসব ঘটনাবলি দেখে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি (সা.) কতটা আবেগাপ্লুত ছিলেন, কিন্তু এই রহস্য একটা সময় পর্যন্ত তাঁর সামনে উন্মোচিত হয় নি। যখন খোদা তা'লা নিজ ওহী দ্বারা নির্দোষ হওয়ার ঘোষণা দিলেন এবং বললেন,

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ

(সূরা নূর-২৭) অতএব তিনি (সা.) উক্ত ইফকের প্রকৃত বিষয়ে অবগত হয়েছেন- এর ফলে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদায় কি কোন আঘাত লাগে? কখনো না। সেই ব্যক্তি জালেম এবং খোদাকে ভয় করে না যে এ ধরনের ধ্যাণধারণা লালন করে। আর এটি কুফরি পর্যন্ত পোঁছে যায়। মহানবী (সা.) এবং অন্যান্য নবী-রসূল কখনো এ দাবী করেন নি যে, তাঁরা আলেমুল গায়েব (তথা অদৃশ্যের বিষয়ে জ্ঞাত)। আলেমুল গায়েব তো খোদা তা'লার গুণ। এরা নবী-রসূলদের সুন্নত সম্বন্ধে অবগত থাকলে এ ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ কখনো করতো না।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৬)

এখনো যারা আপত্তি করে, তিনি তাদেরও নিরুত্তর করে দিয়েছেন।

মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে আওস এবং খাযরাজ গোত্রের মাঝে সন্ধি স্থাপনের বিষয়েও উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের পরস্পরের মাঝে কিছু অধিক মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। এক রেওয়ায়েতে উল্লিখিত আছে, মহানবী (সা.) কয়েক দিন পর হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর হাত ধরেন এবং কতিপয় সাহাবীর সাথে তাকে নিয়ে বের হন এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর কাছে গিয়ে উপণীত হন। সেখানে কিছুক্ষণ কথা বলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) খাবার উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.), হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরা সেখান থেকে খাবার খেলেন। এরপর তিনি (সা.) সেখান থেকে চলে গেলেন। এরপর তিনি (সা.) কিছুদিন চুপচাপ থাকেন। এর কিছুদিন পর পুনরায় তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদার হাত ধরেন এবং কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে এবারে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর ঘরে গিয়ে উপণীত হন। কিছুক্ষণ কথা বলেন। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) খাবার উপস্থাপন করেন আর তিনি (সা.), সা'দ বিন উবাদা (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরা খাবার খেলেন, এরপর তিনি (সা.) পুনরায় চলে গেলেন। তিনি (সা.) এমনটি করেছেন কারণ, তাদের হৃদয়ে পূর্বোক্ত কারণে যে কদর্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা যেন শেষ হয়ে যায়।

(কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭১)

অর্থাৎ একবার একজনকে নিয়ে অন্যজনের ঘরে গেলেন আবার পুনরায় দ্বিতীয়জনকে নিয়ে প্রথমজনের ঘরে গেলেন যেন তাদের পারস্পরি ক মনোমালিন্য দূর হয়ে যায় আর সেখানে খাবার খেলেন এবং তারা একে অপরকে খাবার খাওয়ালেন আর এভাবে মনোমালিন্য দূর হয়ে গেল। পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতা ও সন্ধি স্থাপন করানোর ক্ষেত্রে এটিও তাঁর (সা.) একটি পদ্ধতি ছিল।

রেওয়ায়েতে অভিযোগ আরোপকারীদের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অভিযোগ আরোপকারীদের সংখ্যা বলা হয়েছে তিনজন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, তদনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল তিন থেকে দশজন। ইবনে উয়াইনা তাদের সংখ্যা বলেছেন চল্লিশজন আর মুজাহেদ বলেছেন দশ থেকে পনেরজন।

(আল জামিউ লি আহকামুল কুরআন, তফসীর কুরতাবী, ২য় খণ্ড, আয়াত-১২ সূরা নূর, পৃ: ২১৬৯)

ইফকের ঘটনায় যারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদের শাস্তির বিষয়টিও জানা যায়। সুনান আবু দাউদ গ্রন্থে রেওয়ায়েত আছে যে, মহানবী (সা.) দুইজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে অপবাদ আরোপের কারণে শাস্তির আদেশ দিয়েছিলেন যারা অশ্লীলতার অভিযোগ আরোপ করেছিলেন। (দুজন ছিলেন) হযরত হাসসান বিন সাবেত এবং মিসতাহ বিন উসাসা। নুফায়লী বলেন যে, মানুষের ভাষ্যমতে সেই মহিলা ছিলেন হামনা বিনতে জাহাশ।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস-৪৪৭৫)

আল্লামা মাওয়ারদী বলেন যে, ইফকের ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বেত্রাঘাত করার বিষয়ে মতানৈক্য আছে। একটি ভাষ্যমতে মহানবী (সা.) এদের মধ্য থেকে কাউকেই বেত্রাঘাত করান নি আর অপর বর্ণনামতে মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই, মিসতাহ বিন উসাসা, হাসসান বিন সাবেত এবং হামনা বিনতে জাহাশকে বেত্রাঘাত করিয়েছিলেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, রেওয়ায়েতে যে বিষয়টি খ্যাত এবং ওলামাদের কাছে সুবিদিত তা হলো, হাসসান, মিসতহ এবং হামনাকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল কিন্তু ইবনে উবাইকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(আল জামিউ লি আহকামুল কুরআন, তফসীর কুরতাবী, ২য় খণ্ড, আয়াত-১২ সূরা নূর, পৃ: ২১৭০-২১৭১)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এক খুতবায় উক্ত বিষয়ে বলেছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করার কারণে তিন ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল যাদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত হাসসান বিন সাবেত, যিনি মহানবী (সা.)-এর শানে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে উন্নত মার্গে উপনীত ছিলেন। আরেকজন ছিলেন মিসতাহ যিনি সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.)-এর চাচা ছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর খালাতো ভাই ছিলেন। তিনি এতই দরিদ্র ছিলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাড়িতেই থাকতেন।সেখানেই খাবার খেতেন আর তিনিই তার জন্য কাপড় তৈরি করে দিতেন এবং এক মহিলা তার সাথে ছিল; এ তিনজনের শাস্তি হয়েছিল।"

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৮, পৃ: ২৭৯-২৮০)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নূরের ৩৬নং আয়াতের তাফসীরে আরও লিখেছেন। তিনি (রা.) ইবনে সলুলকে চাবুক মারার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি বলেন, لِكُلِّ امْرِءٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ অর্থাৎ, এই অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি যেরূপ অপকর্ম করেছে তেমনই শাস্তি সে পাবে। অতএব, যারা অপবাদ আরোপের ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল তাদেরকে আশিটি করে চাবুকাঘাত করা হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যে সবচেয়ে বড় দুষ্কৃতকারী এবং যে এ সমস্ত অপকর্মের হোতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল, আমরা তাকে শুধু বেত্রাঘাতই করব না, বরং নিজেরাও তার শাস্তি দেব। অতএব এই শাস্তির প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল। (আসসীরাতুল হালবিয়া, বাব মাগাযিয়া) এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং রসূল করীম (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই সে চরম লাঞ্ছনার সাথে মৃত্যুবরণ করে।" (তফসীরে কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫২৪)

এ ঘটনা এখানেই শেষ হচ্ছে। জার্মানির জলসার ব্যাপারে এতটুকুই বলতে চাই যে, অংশগ্রহণকারীদের মাঝে অ-আহমদী বা যারা প্রথমবারের মতো এসেছেন তারা দারুণ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেছেন এবং পরিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। একইসাথে গণমাধ্যম ও সংবাদ মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আহমদীয়াত ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছেছে। জলসা এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তবলীগেরএকটি বড় মাধ্যম। যেখানে আমরা পৌঁছাতে পারি না, সেখানে এর মাধ্যমে তবলীগের কাজ হয়, ইসলামের বাণী পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম ও সু দূ রপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনুন এবং আহমদীদেরও সর্বদা প্র কৃত অর্থে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন ।দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর করুণা ও রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন।

পরিশেষে আমি একজন মরহুমের স্মৃতিচারণও করব এবং আমি তার জানাযা পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্ । ইমাম মুহাম্মদ বেলো সাহেব, যিনি সুদানের অধিবাসী ছিলেন সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সুদান জামাতের প্রেসিডেন্ট তার সম্পর্কে লিখেছেন, তার বয়াতের ঘটনা হল, ১৯৬৬ সালে নাইজেরিয়া থেকে একজন আহমদী ইমাম ঈসা আবদুল্লাহ বিন লাইল তার বাড়িতে অতিতি হিসাবে এসেছিলেন এবং গ্রামবাসীকে তবলীগ করেছিলেন। মরহুম ইমাম মুহাম্ম বিন বেলোর সর্বপ্রথম বয়াত করার সৌভাগ্য লাভ হয়। তখনকার দিনে যুগ খলিফার সাথে সুদানের কেন্দ্রের যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না, তথাপি এই আহমদী বন্ধুরা আহমদীয়াতের বিশ্বাসে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের প্রচন্ড বিরোধিতা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ বেলো সাহেব আহমদীদের নামাযে ইমামতি করতেন। সেখানে আহমদীরা ঘাস ও খড় দিয়ে তৈরি একটি কুঁড়েঘরের মতো মসজিদ তৈরি করেছিল, যাতে অ-আহমদীরা আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আহমদীদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। এতে আহমদীরা দক্ষিণে হিজরতে করে। সেখানেও আহমদীরা ঘাস ও খড় দিয়ে তৈরি একটি কুঁড়েঘরের মতো মসজিদ তৈরি করে। সেখানেও বিরোধীতা হয় এবং বিরোধীরা আহমদীদের মসজিদ জ্বালিয়ে দেয় এবং আহমদীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। সেখানকার আহমদীদের একটি দল দূরে কোথাও হিজরত করেন আর বাকীরা আরেকটি শহরে চলে যায় যাদের মাঝে ইমাম বেলোও ছিলেন। সেখানে এ লোকেরা আব্দুল্লাহ বিন অওয কাসেম সাহেবের অতিথি হয়েছিলেন, যিনি জামিয়া বখতুর রেযার প্রিন্সিপাল ছিলেন, কিন্তু তার বংশের লোকেরা বিরোধিতা করলো এবং এই আহমদীদের সেখান থেকে বের করে দিল। সেখান থেকেও এই অসহায়দের বিতাড়িত করা হয়। অবশেষে তারা নাইজেরিয়ায় ইমাম ঈসা আব্দুল্লাহ্ লেয়েল সাহেবের নিকটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার মাধ্যমে তারা আহমদী হয়েছিলেন। অতঃপর দরিদ্র আহমদীদের এই দল স্ত্রী-সন্তানসহ গাধা ও অন্যান্য পশুর পিঠে আরোহন করে আর অধিকাংশ পায়ে হেঁটে নাইজেরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাদের কাছে কোনো পাথেয় ছিল না। ভিসা ও অন্যান্য কাগজপত্রও ছিল না। যাত্রাও বড়ই দুষ্কর ছিল। হ্যাঁ, তাদের কাছে কেবলমাত্র ঈমানের সম্পদ ছিল। তারা নিজেদের ঈমান খুবই সযত্নে রেখেছিলেন। সেই (ঈমানের) স্পৃহা ও উদ্দীপনার সাথে হিজরত অব্যাহত রাখেন। কখনো স্বীয় ধর্মকে বিসর্জন দেন নি। অবশেষে তারা নাইজেরিয়াতে পৌঁছান। সেখানে তারা ইমাম ঈসা বিন লেয়েল সাহেবের কাছে তের বছর অবস্থান করেন। এরপর ইমাম ঈসা সাহেবে একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তাদেরকে পুনরায় সুদানে ফিরে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। তারা একথা অপছন্দ করেন। তখন ইমাম ঈসা সাহেব তাদেরকে বলেন, এটি আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আদেশ করা হয়েছে। এরফলে তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুদানে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ইমাম ঈসা সাহেবকে স্বপ্নে বলা হয়েছিল, তারা তিন বছর পর সুদানে ফিরে যাবেন। তিন বছর পূর্ণ হলে এই আহমদী মুহাজের দল নিজ দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সর্ব প্রথম ইমাম মুহাম্মদ বেলু সাহেব ফিরে যান। সুদানে তারা নিজেদের পূর্বের গ্রাম কুনেযায় গিয়ে থিতু হন। এটি ২০১০ সালের ঘটনা। এই আহমদীদের সুদানে যাওয়ার পর নাইজেরিয়াতে 'বোকো হারাম' নামের এক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই সুদানী আহমদীরা যদি সেই সময় নাইজেরিয়াতে অবস্থান করতেন তবে আল্লাহ্ই ভালো জানেন এই সংগঠন তাদের সাথে কী আচরণ করত। তখন তারা বুঝতে পারেন নাইজেরিয়া থেকে তাদের প্রত্যাবর্তনের পিছে ঐশী কী প্রজ্ঞা অন্তর্নি হিত ছিল। তবুও কুনেযায় ফিরে আসার পর তাদেরকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখিন হতে হয়। তারা যে ছোটো মসজিদ বানিয়ে ছিলেন তা আবার জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তাদের ঘর-বাড়ি আক্রান্ত হয়। তাদের নামে মামলা-মোকাদ্দমা দায়ের করা হয়। তাদেরকে গ্রাম থেকে পুনরায় বের করে দেওয়া হয়। পরিশেষে বর্ত মান যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় যার ফলে সমগ্র সুদান জুরেই অবস্থার অবনতি ঘটে আর সেখানে কেউই আর নিরাপদ থাকল না। এই আহমদীরাও নিজ জীবন বাঁচানো এবং নিরাপত্তা লাভের খাতিরে সুদানের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানেও তারা বিভিন্ন এলাকায় খুবই অভাব-অনটন ও দারিদ্রতার মাঝে জীবন যাপন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। (তার সাথে) ক্ষমার আচরণ করুন। অন্যান্য আহমদীদের ঈমানকে সুদৃঢ় রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অবস্থাও পরিবর্তন করুন। যেমনটি আমি বলেছি, দেশে ভীষণ বিশৃঙ্খলা চলমান আছে। আল্লাহ্ তা'লা এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপা করুন। তারা যেন পরস্পরের অধিকার প্রদানকারী হয়। মুসলমান মুসলমানের ভাই হওয়ার যে অধিকার তা যেন আদায়কারী হয়। ইসলামী দেশসমূহে যে বিশৃঙ্খলা বিরাজমান রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তা দূর করুন। এবং আহমদীদেরকে প্রকৃতার্থে শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করুন।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল,২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪)

****

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ-নির্দেশনা।

"আমি বারবার পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, সন্তানরা বাইরে কেমন পরিবেশে ওঠা-বসা করে তার প্রতিও দৃষ্টি রাখুন আর ঘরে যখন তারা টিভির প্রোগ্রাম দেখে বা ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে তখনো সজাগ দৃষ্টি রাখুন।"

(খুতবা জুমআ, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩,বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, 'যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।'

* ফটো সম্পর্কে হুযুর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু তার পরে ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না। সূত্র: পাক্ষিক আহমদীয়া, ৩১ শে জুলাই, ২০১৩

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন-

"একটি মেয়ে যখন নিজের পিতামাতার বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাড়ি আসে তখন যদি তার সাথে সদ্ব্যবহার করা না হয় আর শ্বশুরালয় যদি যৌথ পরিবার হয় তাহলে এ ঘরে তার অবস্থা তেমনিই হয় যা এক কারাবন্দির হয়ে থাকে; আর বন্দিও এমন, যার খবরই কেউ রাখে না। মেয়ে নিজে পিতামাতাকে বলে না আর পিতামাতও ঘর ভাঙার ভয়ে জিজ্ঞেস করে না। অতএব মেয়ে যদি এভাবে ধুকে ধুকে মরতে থাকে তবে এটি মহা অন্যায় কাজ।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ শে জুলায়, ২০০৪)

আঙুলের এত গুরুত্ব যে আল্লাহকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করতে তোমরা যখন এই আঙুলটি তোল, তখন আল্লাহ্‌র নাম এখানে রাখতে পার না? অদ্ভুত বিষয় তো!

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার কাল আমাদের মসজিদ দারুল আমান-এর উদ্বোধন করেছেন। আমার প্রশ্ন হল, ইমাম সাহেব যদি পুরুষদের অংশে নামায পড়ান, আর মহিলাদের দিকের শব্দ আসা বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেই পরিস্থিতিতে কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিজের নিজের নামায পড়ে নিও। তোমাদের মসজিদে মহিলাদের অংশটি একটি পর্দার মাধ্যমে পৃথক করা হয়েছে। তাই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও আওয়াজ তো আসবে।

প্রশ্ন: ওয়াকফে নও মেয়েরা কি পুলিসে যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: পুলিসে আমাদের ওয়াকফে নও-এর প্রয়োজন নেই। আহমদীরা এমন অপরাধ করেই না, যার জন্য পুলিসে যাওয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে। তুমি পুলিসে গেলে সেখানে পুলিসের জন্য পৃথক প্রশিক্ষন কলেজ তো নেই। তোমাকে পুরুষদের সঙ্গেই প্রশিক্ষণ নিতে হবে, তাদের পোশাকই পরতে হবে। তাদের উর্দি পরতে হবে, তোমার হিজাবও থাকবে না, লজ্জাশীলতাও থাকবে না। তাই কেবল ওয়াকফে নও-এর প্রশ্ন নয়, কোন আহমদী মেয়েরই পুলিসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার তাঁর বক্তব্যগুলি নিজে লেখেন না কি কাউকে দিয়ে লেখান?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি নিজের বক্তব্য নিজেই লিখি, নিজেই প্রস্তুত করি, আর এ সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না। আমি তো শেষ মুহূর্তে বক্তব্য লিখে নিয়ে যাই কিম্বা কেবল নোটস তৈরী করে নিয়ে যাই। আর বক্তব্য দেওয়ার সময়ও সেটি নিবন্ধের রূপ পায়। আর আমার নোটগুলি আমি ছাড়া কেউ পড়তেও পারবে না। অন্য কোন ব্যক্তি আমাকে বক্তব্য লিখে দিতেই পারে না, তবে কিছু বই-পুস্তকের উদ্ধৃতি বের করে প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবকে দিয়ে দিই, তিনি আমাকে বই থেকে প্রিন্ট বের করে দেন। অনেক সময় প্রিন্টও নিই না, বইয়ের উদ্ধৃতিও আমি নিজের হাতে লিখে নিই।

প্রশ্ন: অনেকে আমাদের প্রশ্ন করে যে আমরা সীরাতুন্নাবী জলসা কেন উদযাপন করি না যেভাবে আমরা মসীহ মওউদ দিবস এবং মুসলেহ মওউদ দিবস উদযাপন করে থাকি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সীরাতুন্নাবীন জলসা আমরা উদযাপন করি না এমন কথা কে বলেছে? আমরা মীলাদুন্নাবী জলসার আয়োজন সেই দিনটিতে করি না যা অ-আহমদীরা আরম্ভ করেছে। সীরাতুন্নবী জলসা তো আহমদীরাই প্রথম আরম্ভ করেছিল। এর আগে তা কোনদিন হত না। হিন্দু ও খৃষ্টানরা যখন আঁ হযরত (সা.)-এর উপর আপত্তি উত্থাপন করতে শুরু করল, সেই সময় সর্বপ্রথম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এগিয়ে এসে তাদের উত্তর দেন এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর যগে জলসার প্রচলন শুরু হয়। কাদিয়ানে অনেকবার এমনও হয়েছে যে এই জলসার সময় অনেকবার মিছিলও বের হয়েছে। মিছিল এর অর্থ দরুদ পাঠ করতে করতে দলে দলে মানুষ অলিগলিতে হেঁটে চলত। তাই আমরা এই জলসা উদযাপন করি আর আমরাই এর সূচনা করেছি। অন্যরা বছরে কেবল একদিন মীলাদুন্নাবী জলসা করে থাকে, সেখানে তারা কয়েকজন ভাষণ দেয় মাত্র, কাজের কিছু করে না। আমরা বছর ব্যাপী সীরাতুন্নাবী জলসা উদযাপন করে থাকি। জার্মানীতে সর্বত্র উদযাপিত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ সমূহের উত্তর আমরাই সব থেকে বেশি দিয়ে থাকি। ডেনমার্কে যে কার্টুন বিতর্ক হল তার উত্তর কি কোন মুসলমান প্রেসিডেন্ট, বাদশাহ বা তাদের উলেমারা দিয়েছিল? আমিই তার উত্তর দিয়েছিলাম। আর সর্বপ্রথম আমি উত্তর দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিলাম। নিরবিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি জুমার খুতবায় আমি এর উত্তর দিয়েছিলাম। এর পরেও কয়েকবার আপত্তি উঠেছিল, তখনও আমি এর উত্তর দিয়েছিলাম। আমার পূর্বের খলীফাগণও এভাবে উত্তর দিয়ে এসেছেন। আমার যতগুলি খুতবা ছিল, নাইজেরিয়ার সংবাদমাধ্যম সেগুলির অনুবাদ করে সেখানে প্রকাশ করেছে, আর তারা লিখেছে যে আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী এবং এভাবে এই অভিযোগ খণ্ডণে এমন সুন্দর উত্তর দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের সকলের শেখা উচিত। তাই লোকেরা তো আমাদের কাছে শিখতে চায়। আর তুমি বলছ, আমরা নাকি (সীরাতুন্নাবী জলসা) উদযাপন করি না। আমরা বছরে একাধিক বার উদযাপন করি, শুধু একবার নয়। আমরা তো বলছি, বার বার উদযাপন কর, আমাদের প্রিয় প্রভুকে গুণে গুণে স্মরণ করো না, নিরন্তরভাবে এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাও।

প্রশ্ন: একটা পাকা বয়স থাকে যখন থেকে রোযা রাখা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেই বয়স কোনটি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, তোমরা যেহেতু এখন ছাত্র জীবনে আছ আর এখন তোমাদের বেড়ে ওঠার বয়স তাই এখন রোযা রেখো না। কিন্তু দুই-একটি করে রোযা রাখা অভ্যাস করা উচিত আর যখন সতেরো কিম্বা আঠারো বছর বয়সে উপনীত হও, তখন রোযা রাখা উচিত। কিন্তু সেই সময়ও যদি পরীক্ষা থাকে, আর সে কারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, দীর্ঘ রোযা রাখতে না পার, তবে রোযা পরে পূর্ণ করো। তবে রোযা রাখার ক্ষেত্রে অজুহাত দেখানো উচিত নয়। আঠারো বছর পরিণত বয়স, এই বয়সে রোযা রাখা উচিত। আর এর আগে রোযা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

প্রশ্ন: মেয়েদের জন্য কোনও জামেয়া নেই কেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের আর্থিক সঙ্গতি যখন সেই পর্যায়ে পৌঁছবে তখন মেয়েদের জন্যও খুলব। আগে ছেলেদেরটা পুরো হতে দাও। মেয়েদের জন্যও রয়েছে। যেমন- রাবোয়াতে আয়েশা একাডেমি, যেখানে মেয়েরা ধর্মীয় শিক্ষাও অর্জন করে, কুরআন হিফয-ও করে। কানাডার জামাত আয়েশা একাডেমি খুলেছে। সেখানেও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়, বর্তমানের তাদের প্রথম ব্যাচ পাস হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার কোর্স তারা দুই বছরের রেখেছে। কুরআন করীম হিফযের ক্লাস, যেখানে কুরআন মুখস্ত করানো হয়। তাই জার্মানী জামাতের আর্থিক সংগতি তৈরী হলে তারাও খুলতে পারবে।

প্রশ্ন: এবছর আমি ভারতে গিয়েছিলাম। আমি জানতে চাই যে, বায়তুদ দোয়া গিয়েছিলাম, সেখানে ছবি তোলার অনুমতি নেই কেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনেক সময় লোকে ছবিও তুলেও নেয়। এরপর অনেকে বিদাতে লিপ্ত হয়। এই সব বিদাতের অবসান হওয়া কাম্য। এমনিতেও বায়তুদদোয়ার ছবি আমাদের ক্যালেন্ডার এবং বই-পুস্তকে ছাপানো হয়েছে, যেখানে মানুষ দোয়ারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তাই এমন কোন বিষয় নয় এটি, নিষিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন: জামাত আহমদীয়ার সঠিক অর্থ কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা ছেলে এবং মেয়ে উভয়ে একই ধরণের প্রশ্ন করছ। যাইহোক, প্রতি দশবছর অন্তর সরকার দেশের জনসংখ্যা গণনা করে। যার মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে জনসংখ্যায় পুরুষ ও মহিলা ও শিশুর অনুপাত কত। এছাড়া শিক্ষিতের হার, বিভিন্ন ধর্মের অনুপাত ইত্যাদি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একে বলা হয় আদমশুমারি। ১৯০১ সালে ভারতে যখন আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেই সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, আহমদীরা আদমশুমারীতে নিজেদেরকে আহমদী মুসলমান বলে উল্লেখ করবে, যাতে অ-আহমদী মুসলমানদের থেকে আমরা পৃথক থাকি। কেননা আহমদ নাম আঁ হযরত (সা.)-এর ও আছে, মহম্মদ ও আহমদ উভয় নামই তাঁর। আর আহমদের জ্যোতির্বিকাশ মসীহ মওউদ এর যুগে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়া অবধারিত। অর্থাৎ- বিনয় ও ভালবাসা সহকারে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়াই মসীহ মওউদ এর কাজ ছিল। আমরা এজন্য আহমদী লিখি যাতে আমরা ইসলামের তবলীগ ভালবাসার মাধ্যমে করে চলি আর অন্যান্য মুসলমানদের থেকে পৃথকভাবে নজরে আসি। কেননা হাদীসেও বর্ণিত আছে, বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, যখন মসীহ্‌র আগমণ ঘটবে, তখন তিনি যুদ্ধকে স্থগিত করবেন, যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন।

প্রশ্ন: তুর্কীদের ঈদ আমাদের থেকে একদিন পূর্বে কেন হয়?

তুর্কীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কেন এমনটি করে? আমরা তো চাঁদ দেখে ঈদ উদযাপন করি। তুর্কিদের ঈদ একদিন আগে হয়, কারণ তারা চাঁদ না দেখেই ঈদ করে আর আমরা চাঁদ দেখে ঈদ করি। যেহেতু চাঁদ তো দেখতেই পায় না আর হিসেব অনুসারে যেদিন আমরা ঈদ করি, তার আগে চাঁদ দেখা পাওয়া সম্ভবই নয়। এই কারণে আমরা অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখি যে, সেদিন চাঁদ দেখা যেতে পারে বা যদি চাঁদ দেখা যায় তবে আমরা ঈদ করি আর যদি না দেখা যায় তবে সেদিন ঈদ করি যেদিন গণনা অনুসারে চাঁদ দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন: আমার কাছে এক তুর্কি বন্ধু আছে। সে বলছিল, নামাযের জন্য ওযু করার আগে সে নেল পালিশ ব্যবহার করে না, নেল পালিশ মুছে ফেলে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এর অর্থ তারা বছরে একবার নামায পড়ে। প্রতিবার এমনটি হতে পারে না- দিনে পাঁচ বার নেল পালিশ লগিয়ে পাঁচ বার তা তুলে ফেলা সম্ভব নয়। ওযু করার উদ্দেশ্য হল হাত, মুখ ধুয়ে পরিস্কার হয়ে যাওয়া। সারা দেহের পরিচ্ছন্নতা অর্জনই হল ওযুর উদ্দেশ্য। যে নেল

পালিশ তোমরা ব্যবহার কর তা তো সীল করে দেয়, নখ এবং নেলপালিশের মাঝে বাতাসও তো পৌঁছয় না। যেহেতু বাতাস যায় না, তাই নেল পালিশের উপরের অংশে যে নোংরা থাকে তা ধুয়ে পরিস্কার হয়ে গেলে নামায বৈধ, নেল পালিশ মুছে ফেলার কোন দরকার নেই।

প্রশ্ন: যেদিন জার্মানীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী আহমদী হয়ে যাবে, সেদিনটি আমরা দেখতে পাব না কি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দেখবে? সেই দিনটি কবে আসবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সেটা তো আল্লাহ্ই উত্তম জানেন, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব না।

কিন্তু সেই দিন নিশ্চয় আসবে।ইনশাআল্লাহ। এখন তা নির্ভর করছে তোমরা দোয়া কতটা কর, কতটা চেষ্টা কর, নিজেদের অবস্থাকে কতটা ব্যবহারিকভাবে পরিবর্তন কর, পুণ্যকর্মের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর। যদি তোমরা সকলে দোয়া করতে শুরু কর, তবে সেই দিনটি নিশ্চয় আসবে,অচিরেই আসবে।কিন্তু পৃথিবীতে এর লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বয়আত হয়, আর এজন্য হয় যে আল্লাহ্ তা'লা সংক্ষিপ্ত আকারে তাদেরকে (আধ্যাত্মিক) দৃশ্য দেখাচ্ছেন। এখন এটি তোমাদের দোয়ার উপর নির্ভর করছে। তোমাদের দোয়ার অর্থ সমগ্র জামাতের দোয়া।

প্রশ্ন: হযরত মহম্মদ (সা.) একটি হাদীসে বলেছেন, এক ব্যক্তি আসবে যে নিজেকে বাদশাহ মনে করবে, যার একটি চোখ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হবে আর অপরটি দৃষ্টিহীন হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হ্যাঁ, এটি তো দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীস যা দীর্ঘ হাদীস। এক চোখে দৃষ্টিহীন হবে, এক চোখ স্ফীতাকার হবে। দাজ্জাল সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে। যখন দাজ্জাল আসবে, অর্থাৎ যে পরাশক্তিগুলি ধর্মকে গুরুত্ব দেয় না, তাদের ধর্মের চোখটি অর্থাৎ ডানচোখটি অন্ধ। আর বাম চোখ যেটি দ্বারা সে পৃথিবীকে দেখে, তা বোঝার জন্য সূরা কাহাফ পাঠ কর। এর অনুবাদ লেখা আছে, সঙ্গে দেওয়া পাদটিকাও পড়ে নিও, বুঝতে পারবে।

প্রশ্ন: ওয়াকফে নও মেয়েরা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা হতে পারে কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু এখানে পড়ার জন্য চেষ্টা কর এমন জায়গায় গিয়ে ভর্তি হওয়ার যেখানে স্কার্ফ পরে পড়ার অনুমতি আছে। যদি অনুমতি না থাকে আর জোর করে স্কুল কলেজে স্কার্ফ খুলে ফেলতে হয়,তবে স্কার্ফ খুললে স্কুলের গেটের বাইরে আসতেই স্কার্ফ পরে নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে জান্নাত মায়েদের পায়ের নীচে রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ছেলে ও মেয়েরা কি একই ধরণের সব প্রশ্ন একত্রিত করেছে? ছেলেদের কে এর উত্তর দিয়েছি, তাদের কাছ থেকে জেনে নিও।

প্রশ্ন: পিতাদের পায়ের নীচে জান্নাত নেই কেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আঁ হযরত (সা.) কে জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করেন, 'আমার উপর সব থেকে বেশি অধিকার কার?' আঁ হযরত (সা.) উত্তর দেন, 'তোমার মায়ের'। সেই সাহাবী বলেন, এর পর কার?' তিনি বলেন, ' তোমার মায়ের'। সাহাবী বললেন এরপর কার?' তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের।' সেই সাহাবী পুনরায় বললেন এরপর কার? চতুর্থবার তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার পিতার।' কেননা মা সন্তানকে জন্মও দেয়, তার কারণে কষ্ট ও যন্ত্রণাও সহ্য করে এবং তার লালন পালনও করে। পিতা তো বাইরের কাজে নিয়োজিত থাকে। ঘরে থাক মা আর মায়ের সঙ্গে সন্তানের বেশি নিবিড়তা থাকে। তরবীয়তের সময়কালটুকু মায়ের সঙ্গে কাটে। এই কারণে মা যদি সঠিক তরবীয়ত করে তবে বোঝা যায় যে সন্তান জান্নাতে যাবে। আর যদি মা সঠিক তরবীয়ত না করে, তবু সন্তান দোযখে যায় নিজের অপকর্মের পরিণামে।

প্রশ্ন:নিকাহ্ কিংবা বিবাহের ক্ষেত্রে কনের পক্ষ থেকে তার ভগ্নিপতিকে নিকাহ্র ওলী নিযুক্ত করা সম্পর্কে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়ার নাযারাতে এসলাহ্ ও এরশাদ, রিশতানাতা বিভাগের একটি প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৩০ আগস্ট, ২০২০ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।

উত্তর:কনের নিকাহ্র ক্ষেত্রে তার পিতা কিংবা ভাই অনুপস্থিত থাকলে কনের রক্তের আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হতে যিনি মর্যাদার দিক থেকে তার সবচেয়ে বেশি নিকটাত্মীয়- তিনিই তার ওলী হবেন। তবে শর্ত হল, তিনি যেন সকল দৃষ্টিকোণ থেকে কনের স্বার্থকে দৃষ্টিতে রাখেন, যেভাবে স্বয়ং ওলী শব্দটির দাবিও এটিই। কিন্তু কনের যদি কোন রক্তের আত্মীয় না থাকে তাহলে এমন পরিস্থিতিতে খলীফাতুল মসীহ্ তার ওলী হবেন। আর এমন মেয়ের নিকাহ্র জন্য জামা'তের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উকিল নিযুক্ত করা হবে আর এটিই আহমদীয়া জামা'তের প্রচলিত রীতি।

প্রশ্ন:শর্ত সাপেক্ষ তালাক সম্পর্কে রাবওয়ার কাযা বিভাগের শ্রদ্ধেয় নাযের সাহেবের একটি প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৩০ আগস্ট, ২০২০ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।

উত্তর:আমার মতে শর্ত সাপেক্ষ তালাক সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট আর সেসব উদ্ধৃতির বরাতে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, এমন তালাক যাতে কোন শর্ত রাখা আছে, সেই শর্ত পূরণ হয়ে গেলে এই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর পত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)'র যেসব উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন তা পাঠকদের উপকারার্থে নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। (সংকলক)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তব্য- শর্ত সাপেক্ষ তালাক- এ সম্পর্কে বলেন, 'যদি শর্ত আরোপ করা হয় যে, অমুক বিষয় ঘটলে তালাক হবে আর (বাস্তবে) সে বিষয়টি যদি ঘটে যায় তাহলে প্রকৃতপক্ষেই তালাক কার্যকর হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি বলে, অমুক ফল খেলে তালাক হয়ে যাবে আর এরপর সেই ফল খেলে তালাক কার্যকর হয়ে যায়।'

(আল্ বদর, নম্বর: ২১, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২ জুন, ১৯০৩, পৃ. ১৬২)

হযরত পীর সিরাজুল হক নু'মানী সাহেব (রা.) লিখেন-হযরত আকদাস (আ.) বলেছেন, 'মৌলভী সাহেব (মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভী- লেখক)-এর এই মতবাদ কোনভাবেই সঠিক ও যথার্থ নয় যে, পবিত্র কুরআনের ওপর হাদীস অগ্রাধিকার রাখে।

দর্শকবৃন্দ! শোনার মতো কথা হল, পবিত্র কুরআন যেহেতু বিশুদ্ধ ওহী এবং (এর) সকল পবিত্র বাণী মহানবী (সা.)-এর যুগেই সংকলন করা হয়েছিল এবং এগুলো ঐশী বাণী ছিল। কিন্তু হাদীস শরীফের জন্য এমন ব্যবস্থা ছিল না আর এটি মহানবী (সা.)-এর যুগে লেখাও হয় নি। আর পবিত্র কুরআনের যে মান ও মর্যাদা রয়েছে তা হাদীসের নেই, কেননা এটি বিভিন্নজনের বর্ণনার বরাতে (মানুষের কাছে) পৌঁছেছে। কেউ যদি এ বিষয়ে শপথ করে যে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি অক্ষর ঐশীবাণী আর এটি যদি ঐশীবাণী সমৃদ্ধ না হয় তাহলে আমার স্ত্রীর তালাক হয়ে যাবে, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তার স্ত্রীর ক্ষেত্রে তালাক প্রযোজ্য হতে পারে না (কেননা, কুরআনের প্রতিটি অক্ষর ঐশীবাণী- অনুবাদক)। আর কেউ যদি হাদীস সম্পর্কে শপথ করে আর বলে, হাদীসের প্রতিটি অক্ষর ও প্রতিটি শব্দ ওহীসমৃদ্ধ, যা মহানবী (সা.)-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। যদি (সত্যিকার অর্থেই) এটি না হয় তাহলে আমার সহধর্মিনীর তালাক হয়ে যাবে তাহলে তার স্ত্রীর তালাক কার্যকর হওয়াতে কোন সন্দেহ ও সংশয় নাই (কেননা, হাদীস ষোলোআনা ঐশীবাণী সমৃদ্ধ নয়- অনুবাদক)। এটি হযরত আকদাসের মৌখিক বক্তব্যের সারমর্ম। [তাযকেরাতুল্ মাহদী, রচয়িতা: হযরত পীর সিরাজুল হক নু'মানী সাহেব (রা.), পৃ. ১৬১, ১৯১৫ সালের জুন মাসে প্রকাশিত]

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)'র বক্তব্য- 'এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে লিখেন, আমি যদি তোমাকে ঐ বাড়িতে ডাকি অথবা তুমি নিজেই যদি আসো তাহলে তোমার জন্য তালাক। এখন সে তার স্ত্রীকে ঐ বাড়িতে ডাকতে চায়। উত্তর লেখা হয়েছে, ঐ বাড়িতে এলে এক তালাক কার্যকর হবে। যেক্ষেত্রে ঐ সময়ই নিকাহ্ বহির্ভূতভাবে প্রত্যাবর্তন হতে পারে। কিন্তু যদি নির্ধারিত সময় পার হয়ে যায় তাহলে পুনরায় নিকাহ্ করেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

[কাদিয়ান দারুল্ আমান থেকে প্রকাশিত আল্ ফযল পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, নম্বর: ১১৩, ১৪ মার্চ, ১৯১৫, পৃ. ০২]

প্রশ্ন:জনৈক বন্ধু জানতে চেয়েছেন, নফ্স ও রূহ কি একই জিনিস? এছাড়া ঈদের খুতবার বরাতে দার কুতনীতে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করে জানতে চান, "ঈদের নামাযের পর হুযূর (সা.) বলেন, আমরা খুতবা প্রদান করবো, যার শুনতে মন চায় সে বসে থাকুক আর যে চলে যেতে চায় যেতে পারে"- এই হাদীসটি কি সঠিক? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২০ অক্টোবর, ২০২০ তারিখের পত্রে এসব প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর লিখে পাঠান।

উত্তর:পবিত্র কুরআনে রূহ এবং নফ্স শব্দ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রূহ শব্দ, ঐশী বাণী, ফিরিশ্তা, হযরত জিব্রাঈল, নবীগণ এবং সেই রূহ- এর অর্থে বর্ণিত হয়েছে যা আল্লাহ্র আদেশে একটি বিশেষ সময়ে মানুষের হৃদয়ে উপস্থিত হয়। অপরদিকে নফস শব্দটি প্রাণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, ব্যক্তি, প্রাণীজগৎ, অস্তিত্ব এবং উপলব্ধি ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

অভিধানের আলোকে 'রূহ' শব্দটি সেই জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয় যার মাধ্যমে নফ্স বেঁচে থাকে, অর্থাৎ প্রাণ। একইভাবে রূহ শব্দটি ফুৎকার, ওহী এবং এলহাম, জিব্রাঈল, নবুয়্যতের আদেশ, খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশের জন্যও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া দেহের বিপরীতে অন্য একটি জিনিস যা জন্তুজানোয়ারকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে এবং মানুষকে অন্যান্য জন্তুজানোয়ার থেকে পৃথক করে। আর যা মানুষকে খোদাপ্রেমী বানিয়ে দেয়– একেও রূহ বলা হয়।

অপরদিকে 'নফস' শব্দটি অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেহ, ব্যক্তি, রূহ, দেহ ও রূহের প্রতিমূর্তি মানুষ, শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান, সাহস, সংকল্প, একই জিনিস ও মতামত ইত্যাদির জন্য বলা হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআন এবং হাদীস অধ্যয়নে 'নফস' এবং 'রূহ' এর মধ্যে এটিও আরেকটি পার্থক্য বলে প্রতীয়মান হয় যে, নফস'কে নিয়ন্ত্রণ করা, এর সংশোধন করা এবং এর মাঝে কিছুটা পরিবর্তন সৃষ্টি করার ক্ষমতাও আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে দিয়েছেন। এজন্যই পবিত্র কুরআন 'নফস'–এর তিনটি অবস্থা (আম্মারা, লাওয়ামাহ্ এবং মুতমাইন্নাহ্) বর্ণনা করেছে। এছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয় যে মল্লযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুপোকাত করে বরং প্রকৃত বীর সে যে রাগের সময় নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

অপরদিকে 'রূহ' এর বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন এবং মানুষকে এর ক্ষমতা দেন নি। যেমনটি (কুরআনে) বলেছে,

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৬)

অর্থাৎ, 'তুমি বলে দাও, 'রূহ' আমার প্রভু–প্রতিপালকের আদেশে (সৃষ্টি হয়েছে) এবং (এ সম্পর্কে) তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।'

একইভাবে রূহ সম্পর্কে ইসলাম বিভিন্ন প্রশ্ন করাও পছন্দ করে নি। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর আরবী পুস্তক 'নূরুল হক্ক'–এ সূরা আম্বিয়ার এই আয়াতের,

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

(সূরা আল্ আম্বিয়া: ৩৯)। তফসীরে 'রূহ' এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে এর সাথে 'নফ্স'–এরও উল্লেখ করেন। যা থেকে বুঝা যায়, এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। এছাড়া হুযূর (আ.)–এর এই বক্তব্যের আলোকে উভয়টির পার্থক্যও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। হুযূর (আ.) বলেন,

"আমার হৃদয়ে সঞ্চার করা হয়েছে, এই আয়াতে 'রূহ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে নবী, রসূল এবং মুহাদ্দিসদের দল যাদের প্রতি রূহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা অবতীর্ণ হয় আর খোদা তা'লা (তাদের সাথে) বাক্যালাপ করেন। ... এছাড়া খোদা তা'লা তাঁর নবীদেরকে 'রূহ' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ এমন শব্দ দ্বারা– যা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এটি করার কারণ হল, যাতে তিনি সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন যে, সেসব পবিত্র মানুষ তাদের পার্থিব জীবনে নিজেদের সকল শক্তিসামর্থ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজেদের স্বভাবজ প্রবৃত্তি হতে এমনভাবে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যেভাবে আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। আর না তাদের নফস এবং সেই নফসের কামনা–বাসনা অবিশিষ্ট ছিল। আর তারা পবিত্রাত্মার সাহায্যে (কথা বলতো) নিজেদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়, বস্তুত তারা যেন পবিত্রাত্মাই হয়ে গিয়েছিল, যার সাথে নফ্স বা প্রবৃত্তির কোন মিশ্রণ নেই। উপরন্তু জেনে রাখো! নবীরা একই আত্মার মতো... তারা নিজেদের নফ্স, নিজেদের চলাফেরা, নিজেদের স্থিতি, আশা–আকাঙ্ক্ষা এবং নিজেদের আবেগ–অনুভূতি থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যান আর তাদের মাঝে কেবলমাত্র রূহুল কুদুস বা পবিত্রাত্মা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সবকিছু ভেঙেচুরে এবং (সবার সাথে) সম্পর্ক ছিন্ন করে খোদার সাথে গিয়ে মিলিত হন। কাজেই, খোদা তা'লা এই আয়াতে তাদের সংসার বিমুখতা এবং পবিত্রতার বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন আর (এটি) বর্ণনা করতে চেয়েছেন যে, তারা দেহ ও প্রবৃত্তির কলুষ থেকে কীরূপ দূরে আছেন।

অতএব, তাদের নাম তিনি 'রূহ' অর্থাৎ রূহুল কুদুস রেখেছেন যাতে এই শব্দের মাধ্যমে তাদের মহিমার মাহাত্ম্য এবং তাদের হৃদয়ের নির্মলতা সুস্পষ্ট হয় আর সন্নিকবর্তী কেয়ামত দিবসে তাদেরকে সেই উপাধিতে সম্বোধন করা হবে যাতে খোদা তা'লা মানুষজনের সামনে তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রকাশ করেন, যাতে পবিত্র ও অপবিত্রদের মাঝে পার্থক্য করে দেখিয়ে দেন আর খোদার কসম! এটিই চিরন্তন সত্য।" (নূরুল হক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৩–৭৪, প্রথম সংস্করণ)

ঈদের খুতবা শোনা থেকে অবকাশ সংক্রান্ত হাদীসের যতটুকু সম্পর্ক, এই হাদীস যেটি আপনি দার কুতনীর বরাতে আপনার পত্রে উল্লেখ করেছেন, এটি সুনান আবু দাউদেও বর্ণিত হয়েছে। একথা সঠিক যে, মহানবী (সা.) ঈদের খুতবা শোনার জন্য সেরূপ জোরালো তাকিদ প্রদান করেন নি যেভাবে জুমুআর খুতবায় উপস্থিত হওয়া এবং পুরো নীরবতার সাথে তা শোনার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। এর ভিত্তিতেই আলেম–ওলামা এবং ফকীহ্‌গণ ঈদের খুতবাকে সুন্নত এবং মুস্তাহাব আখ্যা দিয়েছেন। তবে, এর সাথে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, মহানবী (সা.) ঈদের (নামাযে) যেতে এবং উম্মতে মুসলেমার জন্য কৃত দোয়ায় শামিল হওয়াকে পুণ্য এবং কল্যাণের কারণ আখ্যা দিয়েছেন। এজন্য এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, এমন মহিলা যার কাছে নিজের ওড়না নেই সেও যেন (তার) কোন বোনের কাছ থেকে ওড়না ধার করে ঈদের (নামাযে) যায়। এছাড়া ঋতুমতী মহিলাদেরকেও ঈদের (নামাযে) যেতে এই নির্দেশনাসহ তাকিদ দিয়েছেন যে, তারা যেন নামাযের স্থান থেকে পৃথক কোন স্থানে বসে দোয়ায় যোগদান করেন।

প্রশ্ন:মোবাইল ফোনের বিভিন্ন এ্যাপস এর মাধ্যমে অন লাইনে অর্থ বিনিয়োগ করে অর্থ উপার্জনের খেলায় যোগদান করা এবং ছোট বাচ্চাদের জন্মদিন পালন আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরস্পরকে মোবারকবাদ দেওয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নসমৃদ্ধ কাদিয়ানের শ্রদ্ধেয় নাযেম সাহেব দারুল্ কাযা'র

পত্রের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২০ অক্টোবর, ২০২০ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর:কাযা বিভাগের সাথে এই প্রশ্ন দুটির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আপনার জ্ঞাতার্থে উত্তর দিচ্ছি, কোনভাবেই এভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে খেলা, যাতে হেরে গেলে নিজের অর্থ নষ্ট হবে আর জিতে গেলে কিছু অতিরিক্ত অর্থ লাভ হবে– তা জুয়া বলে আখ্যায়িত হয়। ইসলাম একে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ আখ্যা দিয়েছে। এমন খেলা– মুখোমুখি বসে খেলা হোক কিংবা বিভিন্ন এ্যাপস এর মাধ্যমে অন লাইনে অর্থ বিনিয়োগ করে খেলা হোক না কেন, সকল পরিস্থিতিতে জুয়া হিসেবেই আখ্যায়িত হয়– যা করতে বারণ আছে। বাড়িতে ছোট বাচ্চাদের পরিবারের লোকদের সাথে এভাবে জন্মদিন পালন করা এবং কেক ইত্যাদি কাটা– যাতে কোন প্রকার বি'দাতের মিশ্রণ না থাকে, অনর্থক খরচ করা না হয় এবং কোন প্রকার অনৈসলামিক কার্যক্রম না হলে এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এর পাশাপাশি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদকা হিসেবেও কিছু না কিছু দেওয়া উচিত এবং বাচ্চাদেরকে এই উপদেশও দেওয়া উচিত যে, তারা যেন সে–দিন (অর্থাৎ জন্মদিনে) বিশেষভাবে নফল আদায় করে এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, তিনি তাদেরকে সুস্বাস্থ্যময় জীবন দান করেছেন এবং অনাগত জীবনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর কৃপা যাচনা করে।

প্রশ্ন:গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে হুযূর আনোয়ার (আই.)–এর সাথে লাজনা ইমাইল্লাহ্, অস্ট্রেলিয়ার ভার্চুয়াল মোলাকাতে নাসেরাতের তরবিয়ত সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

শুরুতেই বাচ্চাদের বলে দিন যে, তোমাদের পোশাক শালীন হওয়া উচিত। তারা যখন বড়ো হবে এবং লাজনা ইমাইল্লায় যোগদান করবে তখন তাদের জানা থাকা উচিত যে, শালীন পোশাকের সাথে হিজাব পরার নির্দেশও আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনেই (এই নির্দেশ) রয়েছে। কাজেই, শৈশবে তাদেরকে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তাই তারা লাজনায় প্রবেশ করে এবং বড়ো নাসেরাত হলে শালীন পোশাক পরবে। শৈশবেই তাদেরকে বলুন, এখন তোমাদের বয়স কম কিন্তু মহানবী (সা.) বলেছেন, 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ' তাই তোমরা শালীন পোশাক পরিধান করো। এরপর যখন বড়ো হবে তখন শালীন পোশাকের পাশাপাশি হিজাবও পরবে। হিজাব পরলে হিজাব নিজেই প্রভাব বিস্তার করে, অনেক মন্দকাজ, অবাধ মেলামেশা, পুরুষদের সাথে (অযথা) কথা বলা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়া থেকে (রক্ষা করে)। যেসব মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে যায় তাদের নিজেদেরই এই উপলব্ধি জন্মে যে, আমাদেরকে হিজাবের সম্মান রক্ষা করতে হবে। কাজেই, আপনারা যদি শৈশবে নাসেরাতের বয়সেই শিশুদের তরবিয়ত করে দেন তাহলে লাজনাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। লাজনাদের কখনও কোন অনুযোগ থাকবে না। এজন্য নাসেরাতদের (তরবিয়ত করা) অনেক বড় কাজ। অতএব, এখন থেকেই তরবিয়ত করলে তা অনেক ফলপ্রসূ হবে কেননা, এসব মেয়েরা যখন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে তখন তাদের জানা থাকবে যে, আমরা কারা? এরপর তাদের এটিও জানা থাকতে হবে যে, আহমদীয়াত কাকে বলে? অনেক মেয়ের এটিও জানা নেই। (বাড়িতে) কুরআনও পড়িয়ে দেওয়া

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর, ২০১২ (মার্চ, এপ্রিল)

ওয়াকফে নও ক্লাস

৫:৪০টায় হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদে আসেন যেখানে ওয়াকফীনে নও ক্লাস শুরু হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস উপস্থাপিত হয়-

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (লা.) বর্ণনা করেন যে, মাদুরে শোয়ার কারণে আঁ হযরত (সা.)-এর শরীরে দাগ ছিল। আমি তা দেখে বললাম- আমাদের জীবন আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনি অনুমতি দিলে এই মাদুরটির পরিবর্তে কোন তোশক দিই যা আপনাকে এই অমসৃণ তল মেঝে থেকে রক্ষা করবে। একথা শুনে হুযুর (সা.) বললেন-এই জগত এর আনন্দ উপভোগের সাথে আমার কিসের সম্পর্ক? আমি এক পথিকের ন্যায় যে ক্ষণিকের বিশ্রামের জন্য ছায়া সুশীতল বৃক্ষের নীচে বসে পড়ে এবং কিছুক্ষণ পর তা ত্যাগ করে পুনরায় যাত্রা শুরু করে দেয়।

(ইবনে মাজা)

এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত উপস্থাপিত হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-স্মরণ রেখো, যে বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার নিকট মানুষের মূল্য বৃদ্ধি করে সেটি হল খোদা তা'লার প্রতি তার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা।... যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখে না, বরং সে প্রবঞ্চক সে কোন উপকারে আসতে পারে? আল্লাহ্ তা'লার নিকট তার কোন মূল্য নেই। সকল মূল্য ও সম্মান বিশ্বস্ততার সাথে সম্পকৃক্ত। ইব্রাহিম (আ.) যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন তা কিসের ভিত্তিতে? ..... ইব্রাহিম সেই ব্যক্তি যে আমার সঙ্গে বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছে। সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, কাফেরদের মূর্তি পূজাকে মেনে নেয় নি। সে খোদার জন্য প্রত্যেক কষ্ট ও বিপদ বরণ নিতে প্রস্তুত হয়েছে। খোদা তা'লা তাকে আদেশ করলেন, তোমার স্ত্রীকে খাদ্য ও পানীয়শূন্য মরুভূমিতে বনবাস দিয়ে এস। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ শিরোধার্য করেছেন। তিনি খোদা তা'লার প্রত্যেকটি আদেশকে তাঁর প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর ও খোদার মাঝে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.) বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা মিলে তাঁকে বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখিয়েছে, তাঁকে ধনসম্পদ দিতে চেয়েছে, রাজত্ব দিতে প্রস্তুত হয়েছে। নারীর প্রতি লোভ থাকলে তাঁকে সুন্দর রমনী উপহার দিতে চেয়েছে। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর একটাই উত্তর ছিল, আমাকে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের শিরক দূর করার জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, এর জন্য তোমরা আমাকে যে দুঃখ কষ্ট দিতে চাও দিতে পার। আমি এই কাজ থেকে বিরত হতে পারি না, কেননা খোদা তা'লা এই কাজ যখন আমার উপর ন্যস্ত করেছেন, তখন পৃথিবীর কোন প্রলোভন ও ভীতি আমাকে এর থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তিনি যখন তবলীগের জন্য তায়েফ গেলেন, তখন সেখানকার দুর্বৃত্তরা তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল, যার আঘাতে তিনি দৌড়তে গিয়ে পড়ে যেতেন, কিন্তু এই দুঃখ ও বিপদ তাঁকে নিজের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে নি। এর থেকে জানা যায় যে, সত্যবাদীরা কিরূপ কাঠিন্য ও বিপদাপদের সম্মুখীন হন। কিন্তু দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও তাঁদের মর্যাদা প্রকাশের জন্য একটা দিন নির্ধারিত থাকে। সেই সময় তাঁদের সত্যবাদিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর এক বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের দিকে ধাবিত হয়।"

তিনি বলেন,'এটা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের সময় আর এটা শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সময় আর ফিরে আসবে না। এটি সেই সময় যখন সকল নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী এখানে এসে শেষ হয়েছে। এই জন্য মানবজাতিকে সততা প্রদর্শন ও খিদমতের এটা শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এরপর আর কোন সুযোগ দেওয়া হবে না। বড়ই হতভাগা সেই ব্যক্তি যে এই সুযোগ হাতছাড়া করে।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫১৬-৫১৭)

ওয়াকফে নও স্কীমের ২৫তম বর্ষ

খোদার পথে জীবন উৎসর্গ করার ইতিহাস ধর্মীয় জগতে অনেক প্রাচীন। এই প্রসঙ্গে সব থেকে বড় দৃষ্টান্ত করেছেন স্বয়ং আম্বিয়া (আ.), তাঁর অনুসারী, তাঁদের খলীফাগণ ও সাহাবাগণ।আহমদীয়া জামাতের সূচনালগ্ন থেকেই অনেক সাহাব ইসলাম আহমদীয়াতের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার তৌফিক লাভ করেছেন। পরে বিভিন্ন যুগে সমস্ত আহমদীকে এই পুণ্যময় পথের প্রতি আকৃষ্ট করতে খোদা তা'লার আদেশে খলীফাগণ একাধিক স্কীমএর প্রবর্তন করেছেন যেগুলির মধ্যে ওয়াকফে জীন্দগী, ওয়াকফে আরজী, ওয়াকফে আওলাদ এবং অবসরের পর ওয়াকফ করার মত স্কীম রয়েছে। এই সমস্ত স্কীমে হাজার হাজার আহমদী যোগদান করে আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজি থেকে অংশ নেওয়ার তৌফিক পেয়েছে।

জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় শতাব্দী শুরুর পূর্বে জামাতের ভবিষ্যত উন্নতির প্রস্তুতির জন্য খোদা তা'লা এক গুরুত্বপূর্ণ তাহরীকের প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি (রাহে.) ১৯৮৭ সালের ৩রা এপ্রিল ওয়াকফে নও তাহরীকের প্রবর্তন করতে গিয়ে বলেন-'খোদা তা'লা এ বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমি যেন আপনাদেরকে আগামী দুই বছরের মধ্যে এবিষয়ের অঙ্গীকার করতে বলি যে, যার পরিবারে সন্তান জন্ম নিবে সেটা খোদার দরবারে উপস্থাপন করবে।" তিনি আরও বলেন, 'আগামী শতাব্দীতে ওয়াকফীনে জীন্দগীর ভীষণ প্রয়োজন পড়বে, কেননা, জামাতের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে লক্ষ লক্ষ সংখ্যক ওয়াকফীনে জিন্দগী এই শতাব্দীতে খোদার দরবারে উপহার স্বরূপ পেশ করব। কিন্তু তাদেরকে ব্যবহার করবে পরের শতাব্দীর আহমদীরা। সুতরাং আমরা এই উপহার পরের শতাব্দীকে দিতে চলেছি, তাই যারা তৌফিক পাচ্ছেন তারা এই উপহার দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত হয়ে যান।"

(খুতবা জুমআ,৩ এপ্রিল, ১৯৮৭)

এই তাহরীকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হুযুর বলেন- পরের শতাব্দীতে সারা বিশ্ব থেকে এক আযিমুশশান ওয়াকফীন শিশুদের বাহিনী সেভাবেই প্রবেশ করবে যেন তারা পৃথিবীকে মুক্ত হচ্ছে আর মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর খোদার দাস হয়ে এই শতাব্দীতে প্রবেশ করবে।ছোট ছোট শিশুদেরকে আমরা খোদার দরবারে উপহার হিসেবে উপস্থাপন করব। আর এই ওয়াকফ এর ভীষণ প্রয়োজন। আগামী একশ বছরে যে বিপুল হারে ইসলাম সর্বত্র বিস্তার লাভ করবে,সেখানে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত দাসের প্রয়োজন হবে যারা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর খোদার দাস হবে। বিপুল সংখ্যক ওয়াকফীনে জিন্দগীর প্রয়োজন, প্রত্যেক পেশার সঙ্গে যুক্ত ও প্রত্যেক দেশ থেকে ওয়াকফীনে জিন্দগীর প্রয়োজন।"

(খুতবা জমআ, ৩রা এপ্রিল,১৯৮৭)

এই আযিমুশশান তাহরীকের সূচনাতেই হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) খোদা প্রদত্ত অন্তদৃষ্টি দ্বারা এই তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত শিশুদের ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ১৯৮৭ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখের পর ১৯৮৯সালে চারটি জুমআর খুতবা প্রদান করেন, যেগুলিতে তিনি শিশুদের জন্মের অনেক আগে থেকে ভবিষ্যতের সমস্ত তরবীয়তী ধাপের বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করেন। একদিকে তিনি যেমন শিশুর পিতামাতার জন্য বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, তেমনি জামাতে সাংগঠিনক দিক থেকেও ওয়াকফে নও বিভাগ গঠন করেন, যেখানে তিনি চৌধুরী মহম্মদ আলী সাহেবকে ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯৯২ সালে যথারীতি ওকালতে ওয়াকফে নও গঠিত হয় আর মহতরম চৌধুরী মহম্মদ আলী সাহেবকেই প্রথম উকিল ওয়াফ নও নিসেবে নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে মহতরম সৈয়্যদ কমর সুলেমান সাহেব ওয়াকফে নও এর উকীল হিসেবে সেবা করছেন।আর লন্ডনে এই বিভাগের ইনচার্জ হলেন মাননীয় ডক্টর শামিম আহমদ সাহেব।এই তাহরীক শুরুতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কেবল দুই বছরের জন্য আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু জামাতের সদস্যদের ইচ্ছায় আরও দুই বছরের জন্য তা বৃদ্ধি করা হয়। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, পরবর্তীতে হুযুর (রাহে.) এই তাহরীককে স্থায়ী রূপ দান করেন এবং ভবিষ্যতের পিতামাতারাও তাদের ভাবী সন্তানদের এই বরকতময় তাহরীকে অংশগ্রহণ করার তৌফিক লাভ করেছে।

খিলাফতে খামিসার শুরুতে এই তাহরীকের বয়স ছিল ষোলো বছর। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) খিলাফতের শুরুতেই ওয়াকফীন ও ওয়াকফাতে নওদের উপর তাঁর কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন আর তিনি ওয়াকফে নও ক্লাসের সূচনা করেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানেই সফরে গিয়েছেন, সেখানেই তিনি ওয়াকফীন ও ওয়াকফাতে নওদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তাদেরকে নিজের সঙ্গে নিয়ে ক্লাস করেছেন।

(ক্রমশ..)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 10 Oct, 2024 Issue No.41

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১০ পাতার পর...)

হয়, হাদীসও পড়িয়ে দেওয়া হয় কিন্তু তারা এটিই জানে না যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কেন এসেছেন? আমাদের কাছে যখন কুরআন আছে, আমাদের কাছে হাদীসও আছে, আমাদের কাছে শেষ রসূল (সা.)-ও আছেন, তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের প্রয়োজন কী? এসব বিষয় শৈশবকাল থেকেই জানা থাকা উচিত- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আসলে কেন এসেছেন এবং কী কাজের জন্য এসেছেন? তাঁর আগমনের কারণ হল, এটিও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল; তা পূর্ণ করার জন্য তিনি এসেছেন। এসব বিষয় শৈশব থেকে মনমস্তিষ্কে বদ্ধমূল করা উচিত। এসব মৌলিক বিষয় জানা থাকলে তারা সম্মুখে এগোবে। বড়ো বড়ো প্রশ্নের উত্তর তো মানুষ শিখেই নেয়। মৌলিক বিষয়াদি তাদেরকে শিখিয়ে দিন। আমার ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস কি তা জানা থাকতে হবে। আমি কেন আহমদী হয়েছি, আমার দায়িত্ব কী? এরপর দেখবেন, বর্তমান লাজনাদের চেয়ে পরবর্তী যে প্রজন্ম আসবে তারা আরও অনেক উন্নতমানের হবে।

প্রশ্ন:এই একই ভার্চুয়াল মোলাকাতে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) টীমের সদস্য হিসেবে কাজ করার এবং অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

উত্তর:নিজে কাজ করা এবং অনেক ভাল কাজ করা তেমন কোন বড়ো বিষয় নয়। যদিও এটি আপনার একটি ব্যক্তিগত গুণ বা দক্ষতা বটে। যেটি ঠিক আছে। নিজে কাজ করে ফেলেছেন, ভাল কাজ করেছেন, উত্তম প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন, খুবই ভাল করেছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি আপনি যদি নিজের টীম গঠন না করেন, আপনার দ্বিতীয় লাইন প্রস্তুত না করেন, যারা পরবর্তীতে আপনার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, তাহলে এর অর্থ হল; আপনি কিছুই করেন নি। নিজে নিজে কাজ করা আসল কাজ নয়। আসল কাজ হল, এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের একটি টীম গঠন করা এবং একটি দ্বিতীয় লাইন প্রস্তুত করা যাতে আপনার বয়স বেড়ে গেলে (আমি বলছি না যে, আপনার বয়স বেড়ে গেছে) কিন্তু যখন আপনার বয়স বেড়ে যাবে তখন যেন কমপক্ষে কাজ করার জন্য অন্য একটি দল আপনি সহজেই পেতে পারেন। অতএব, এখানে উপবিষ্ট প্রত্যেক লাজনা সেক্রেটারির দায়িত্ব হল, আমার বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ অথবা পঞ্চাশ বছর- এটি না দেখে নিজের (বিভাগের জন্য) আপনাকে (কর্মীদের) একটি দ্বিতীয় সারি প্রস্তুত করতে হবে, ঠিক আছে? আর সদর সাহেবাকে নিজের দেশের সকল মজলিসের ভেতর এই চেতনা সৃষ্টি করা উচিত। আর (সকল মজলিসের) প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি সাহেবাদেরও এটি বলা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে আপনি দায়িত্ব পালনকারিণী পেতে থাকেন, যারা (জামা'তের) সিস্টেম সম্পর্কেও অবগত থাকবে। দায়িত্ব যখন স্কন্ধে অর্পিত হয় তখন মানুষ পালন করেই থাকে, এটি তেমন কোন সমস্যা নয়। আপনাদের কাছে কর্মপন্থা আছে, আপনাদের কাছে দস্তুরে এসাসী আছে। আপনারা কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।

কিন্তু আগে থেকেই যদি আপনারা সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকেন তখন আপনাদের ওপর নতুন দায়িত্ব অর্পিত হলে আপনারা সেই কাজকে আরও উত্তমভাবে সমাধা করতে পারবেন।

প্রশ্ন:তবলীগ সেক্রেটারি সাহেবার এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) ইসলামের বাণী বিশ্বজুড়ে প্রচারের দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, উত্তর:রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বয়আত করাবেন না। তবলীগ করার উদ্দেশ্য হল, সেসব মানুষের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে তাই তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সন্নিকটে নিয়ে আসুন। আর এই সহানুভূতির দাবি হল, আমরা যেন তাদের কাছে ইসলামের সঠিক বাণী পৌঁছাই। এর পাশাপাশি আরও দাবি হল, স্বয়ং নিজের মান উন্নত করুন আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজের সম্পর্ক নিবিড় করুন। সেক্রেটারি তবলীগ সাহেবার নিজেরও আল্লাহ্ তা'লার সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে তৌফিক দিন।

প্রশ্ন:১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের এই ভার্চুয়াল মোলাকাতেই এই প্রশ্ন করা হয় যে, আমরা আমাদের মিটিং এর উপস্থিতি কীভাবে বৃদ্ধি করতে পারি? এর উত্তর দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

শুধু (তাদের) পেছনে লেগে থাকুন। স্নেহ-ভালবাসার সাথে বুঝাতে থাকুন। কর্মকর্তা সেজে লোকদের পেছনে লাগবেন না। বড়ো বোনের মতো বা ছোট বোনের মতো বুঝাতে থাকুন। মায়ের মতো পেছনে লেগে থাকুন- তাহলে মানুষ আসবে। আমাদের দায়িত্ব হল, অবিচলতার সাথে বলতে থাকা। মিটিং-এ আকর্ষণীয় প্রোগ্রামও রাখুন। যারা আসে না তাদেরকেই উন্নতি করার সুযোগ করে দিন। তাদেরকে দিয়েই বক্তৃতা ইত্যাদি দেওয়ান তাহলে আপনা-আপনি আসতে থাকবে।

মতানৈক্যের কারণে অনেক সময় কর্মের বাহ্যিক রূপে যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় তা কোন ব্যক্তির উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। বরং আল্লাহ্ তা'লা পরিণামের সময় তার আত্মত্যাগের স্পৃহাকে দৃষ্টিপটে রেখে সেই অনুসারে বিচার করেন।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জ এর ৩৮ নং আয়াতের ব্যখ্যায় বলেন-

এই আয়াতটি থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কর্মের বাহ্যিক রূপ পরিণাম সৃষ্টি করে না, বরং আত্মত্যাগের সেই স্পৃহাই পরিণাম সৃষ্টি করে যা সেই কর্মের নেপথ্যে ক্রীয়াশীল থাকে। অতএব, মতানৈক্যের কারণে অনেক সময় কর্মের বাহ্যিক রূপে যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় তা কোন ব্যক্তির উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। বরং আল্লাহ্ তা'লা পরিণামের সময় তার আত্মত্যাগের স্পৃহাকে দৃষ্টিপটে রেখে সেই অনুসারে বিচার করেন। যেমন এক ব্যক্তির কাছে যদি দশ হাজার টাকা থাকে আর সে সেই অর্থ থেকে একশ টাকা গরীব দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেয়। অপরদিকে এক ব্যক্তির কাছে কেবল দশ টাকা থাকে আর সে তার মধ্য থেকে পাঁচ টাকা দান করে দেয়, তবে এখানে পাঁচ টাকা ও একশ টাকা অনুসারে পরিণাম বের হবে না, বরং এখানে দেখা হবে যে, দুজনের কার কত প্রয়োজন ছিল আর সেই প্রয়োজনের সময় কতটা আত্মত্যাগ করেছে বা উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়টি তাদেরকে এই দানের জন্য উৎসাহিত করেছে আর এদের মধ্যে কোনটি উত্তম। আর এই নীতি অনুসারে যখন প্রতিদান দেওয়া হবে,তখন বাহ্যিক বৈপরীত্য সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি ক্ষতির সম্মখীন হবে না। যেভাবে কেবল পশু কুরবানী কোন উপকারে আসে না, বরং খোদা তা'লার নিকট সেই নিষ্ঠা পৌঁছয় যার দ্বারা তাড়িত হয়ে সেই কুরবানী করা হয়। আর খোদা তা'লার প্রতি সেই ভালবাসা পৌঁছয় যা কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ করে। যার কাছে তাকওয়া আছে তার আট আনাও সেই ব্যক্তির একশ টাকার চেয়ে বেশি মূল্যবান যে তাকওয়াশূন্য। কেননা কুরআন করীমের এই নীতি বর্ণনা করেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা রক্ত ও মাংসের প্রতি দৃষ্টি দেন না,বরং কুরবানীকারীর নিয়্যত বা উদ্দেশ্য দেখেন। একজন ধনী ব্যক্তি অনায়াসে একশটি উট বা দুম্বা খোদার পথে কুরবানী করতে পারে। কিন্তু একজন অভাবপীড়িত ব্যক্তি যে সারা বছর ধরে কুরবানীর জন্য অর্থ সঞ্চয় করে, যে প্রতিদিন এই আকাঙ্খা লালন করে যে, যদি তার কাছে ঈদের সময় কুরবানী করে কিছু মাংস খোদার পথে আর কিছু মাংস বন্ধুদের মাঝে বিতরণ করতে পারত! সে যদি সারা বছর পরিশ্রম ও সঞ্চয় করার পর একটি সামান্য ছাগল বা দুম্বা কুরবানী করে,তবে তুমি কি মনে কর যে, খোদা তা'লা তার সেই তুচ্ছ ছাগল বা দুম্বাকে প্রত্যাখ্যান করবেন?

সমস্ত উন্নতি খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন, "তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খেলাফতের সাথে স?পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খেলাফতকে কায়েমরাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন করো এবং খেলাফতের এ নেযামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের বিপরীতে তারা স?পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেযামে খেলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই কার্যকর হবে না।"

(দরসে কুরআন, পৃ. ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir